নারায়ণ

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

বেণের মেয়ে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১

মায়ার কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না; মস্করীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না; ধাইদের কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। খুঁজিতে উভয় পক্ষের কেহই ত্রুটি করিল না। বিহারীও চারিদিকে লোক লাগাইল; রূপারাজাও চারিদিকে লোক লাগাইল। তাহারা ডাঙ্গা দিয়া গেল, কি জল দিয়া গেল, তাহাই ঠিক হইল না। পাল্কীতে গেল, কি ডুলীতে গেল, কি গাড়ীতে গেল, কি নৌকায় গেল, কিছু স্থির হইল না। যে নৌকায় তাহারা যায়, মস্করী সে নৌকা দূরদেশ হইতে আনিয়াছিল, অমনি অমনি ঐখান হইতেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। সাতগাঁয়ের লোকের সাধ্য কি তাহার কোন সন্ধান পায়। মায়া বেশ মনের আনন্দে আছে। মূর্ত্তি তৈয়ার হইলেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। মূর্ত্তি নড়িবে-চড়িবে, কথা কহিবে। সে ক্রমাগত দেখিতেছে—মূর্ত্তিটি দেখিতে ক্রমেই তাহার স্বামীর মত হইতেছে। তাহারও মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হইতেছে। সে বাপ-মা, সাতগাঁ, গোলা সব ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এক চিন্তায়ই সে মগ্ন আছে।

কিন্তু তার জন্যে সারা বাঙ্গলা তোলপাড় হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সব ক্ষেপিয়াছে।

প্রলয়কাণ্ড হইবেই হইবে। কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। গুরুপুত্র মিটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা মিটামিটীর বিরোধী। গুরুপুত্র বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত। লুই-সিদ্ধার এখনও খবর নাই। তিনি যে কোথায় আছেন, কেহ জানে না। তবে তিনি বাঙ্গলায় নাই। রাজারা সব এক এক দিকে যোগ দিয়াছে; হিন্দুরা হিন্দুর দিকে, বৌদ্ধেরা বৌদ্ধের দিকে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্রই হিন্দুর পক্ষে; নানা শান্তি, নানা স্বস্ত্যয়ন, নানা উপায়, নানা চেষ্টা করিতেছেন; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সকল রকমেরই পরামর্শ দিতেছেন; সময়ে সময়ে যুদ্ধের জন্যও সজ্জিত হইতেছেন; ব্যূহ-রচনা অভ্যাস করিতেছেন; যুদ্ধবিদ্যার পুস্তক পড়িতেছেন; মহাদেবের ধনুর্ব্বিদ্যা, বিক্রমাদিত্যের ধনুর্ব্বিদ্যা, চতুরঙ্গ-বলবিদ্যা পাঠ করিতেছেন। কিসে সধর্ম্মের বিনাশ হয় তাহার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া-ছেন। নিজে অস্ত্র-বিদ্যাও অভ্যাস করিতেছেন। দুর্গনির্ম্মাণ করিতে শিখিতেছেন। বিহার-ওয়ালারা সব বৌদ্ধদের পক্ষে, কিন্তু তাহাদের ঘরে ঘরে ঐক্য নাই। আসল মহাযানীরা ত আর সকলকেই উপেক্ষা করে। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান সব আপন আপন উন্নতিই খোঁজে। সকলে এক হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তবে এবার ব্রাহ্মণ প্রবল, সকল বৌদ্ধেরই সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং মনের দ্বেষ মনেই চাপিয়া সকলে কতকটা পরস্পরের সাহায্য করিতেছেন। তার মধ্যে আবার রূপা রাজা একেবারে ভয়ানক সহজপন্থী, অন্য পন্থা তাহার ভালই লাগে না। যা হোক, এবার যেন সব সধর্ম্মী এক হইয়া উঠিয়াছে।

তারাপুকুরে যুদ্ধসভা বসিয়াছে। রাজা বলিতেছেন, "এই যে বেণেদের বিদ্রোহ, আমি সে বিষয়ে নিরপরাধ। কে যে বিহারী দত্তের মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু সকলেই আমাদের উপর দোষ চাপাইতেছে, আর আমার দেশটা লণ্ড-ভণ্ড করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যখন দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে নৌকা, কিস্তী, মালপত্র সব সরাইয়াছে, তখন আর তাহাদের সঙ্গে মিটামিটীর সম্ভাবনা নাই। আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।"

বাগদী সেনাপতি বলিলেন—"মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আত্মরক্ষার জন্য আমরা সততই প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন, আমরা নিরপরাধ। তাহারাই অত্যাচার করিতে প্রস্তুত; সুতরাং আমাদের উচিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা শত্রুর দেশ আক্রমণ করি।"

রাজা। কিন্তু কে শত্রু, কে মিত্র, এখনও ত সে কথা জানা যায় না।

সেনাপতি। মহারাজ, হিন্দুই শত্রু, বৌদ্ধই মিত্র, এই মনে করিয়া, আসুন আমরা হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করি। হরিবর্ম্মা বড় রাজা; তিনি বেগুনদীর ধারে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। আসুন, আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিই। তিনি গেলেই হিন্দুদের দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অনেক বাদানুবাদের পর তাই সিদ্ধান্ত হইল। রাজা পাঁচ হাজার বাগদী লইয়া তারা-পুকুর রক্ষা করিবেন। সেনাপতি দশ হাজার বাগদী লইয়া বেঙ নদীর দিকে যাইবেন। প্রান্তপালগণ প্রান্ত-দুর্গ সজাগ হইয়া রক্ষা করিবেন।

২

বাগদীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপারাজার সেনায় কেবল বাগদী, বাগদীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, "সব বাগদী সাজ।" বাগদীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমেদের কাজ। আর ঘোড়সওয়ারও ডোম। দশ হাজার বাগদী সাজিলে, সঙ্গে সঙ্গে ৫ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

আগডোম বাগডোম ঘোঁড়াডোম সাজে
ডাল মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামনপাড়া।

ডোমেদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সাড়া ক্রমে হরিবর্ম্মার তাঁবুতে পঁহুছিল। তাঁহার লোকের—চরের অভাব ছিল না। তিনি চর পাঠাইলেন; শুনিলেন—দশ হাজার বাছা বাছা বাগদী যোদ্ধা ও পাঁচ হাজার ডোম লইয়া রূপা রাজার সেনাপতি মেঘা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি জনকতক বিশ্বাসী লোককে বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজাইলেন। তাহারা মেঘার তাম্বুতে ভিক্ষা করিতে গেল। মেঘা তাহাদের পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। তাহাদের সেতো করিয়া লইলেন অর্থাৎ তাহারা তাহাকে গুপ্ত পথ দিয়া বেঙনদীর তাম্বুতে পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু মস্করীর ব্যাপারের পর বাগদীরা আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। সুতরাং মেঘাও এই ভিক্ষুদের উপর দুজন বাগদীকে চর লাগাইয়া দিলেন। দুই তিন দিনের পর তাহারা খবর দিল যে, এরা ভিক্ষু নয়, ও পক্ষের চর। মেঘা আর কিছু না বলিয়া এক দিন ভোরে তাহাদের ডাকাইয়া বলিয়া দিল, "তোমরা এই দণ্ডেই যদি আমার তাম্বু ত্যাগ করিয়া না যাও, তোমাদের আটক করিব ও বধ করিব।" তাহারা ভয় পাইল না; বরং ঝগড়া করিতে লাগিল। মেঘা তখন শূল আনাইল, তাহাদের শূলে চড়াইব বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের বাসা-ঘর, কাপড়চোপড় ঝাড়া দিতে লাগিল। দিতে দিতে দেখা

গেল যে, তাহারা ভিক্ষু নহে। তাহারা ভিক্ষুর কাচ কাচিয়াছে মাত্র; তখন তাহাদের আটক করিয়া কয়েকজন চতুর রক্ষী সৈন্যের অধীনে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মেঘা মনে করিয়াছিল, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হরিবর্ম্মার শিবির ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে; কিন্তু সে শুনিল, তিনি সব খবর রাখেন, আর বেশ প্রস্তুতও আছেন। তখন বাগদীরা তাঁহার দেশ লুঠিতে লাগিল। প্রজারা গিয়া হরিবর্ম্মাকে জানাইল। হরিবর্ম্মা ভৈরব নদীর ধারে আসিয়া তাহাদের সামনা হইলেন। আর ভৈরব নদী দিয়া অনেক নৌকা আসিয়া ক্রমাগত লোক নামাইতে লাগিল। মেঘা বেগোছ দেখিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিতে লাগিল এবং পিছনে যাহা কিছু পাইল, ধ্বংস করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সকল নদীতেই হরিবর্ম্মার নৌকা আর বেণেদের নৌকা। নৌকায় কেবল লোক আর অস্ত্র-শস্ত্র। নদী পার হওয়া মেঘার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাগদীদের সাহস অসীম, তাহাদের সম্মুখে কেহ আসিতে সাহস করে না, এলেই সর্ব্বনাশ। এক একবার তাহারা তাড়াইয়া যায়, আর হিন্দুদের কিছু সৈন্য ক্ষয় করিয়া দেয়। যাহা হউক, তাহারা ক্রমে আসিয়া যমুনার ধারে দাঁড়াইল। হিন্দুরাও সেইখানে দাঁড়াইল। কেহও কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। মেঘা রূপা-রাজাকে আরও সৈন্য পাঠাইতে লিখিতে লাগিল। সৈন্যও আসিতে লাগিল। একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগদীদের নৌকা বেণেদের নৌকা তাড়াইতে লাগিল। বেণেরা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। বাগদীরা অনেক খাবার পাইল এবং সেগুলা ডাঙ্গায় তুলিয়া তাম্বুর মধ্যে আনিয়া ফেলিল। কেন না, তাহারা ঠিক জানিত, হরিবর্ম্মার নৌকা আসিয়া জুটিলে তাহারা হারিয়া যাইবে। হইলও তাহাই। হরিবর্ম্মার নৌকা আসিলে নাউপালা হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে বাগদীরা মহাতেজে তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। হরিবর্ম্মার অনেক নৌকা ডুবাইল, অনেক ক্ষতি করিল; কিন্তু দুই তিন দিনের পর হারিয়া পলাইয়া গেল ও নাউপালায় যাইয়া আরও নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিল ও সাতগাঁর সীমানায় না আসে, তার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ডাঙ্গায় যুদ্ধের আগে অন্য জায়গায় কি হইতেছে তাহার খবর লওয়া যাক্।

৩

ওদিকে মহীপাল উত্তররাঢ় হইতে ৫০০০এর অধিক সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না; কারণ কাশীরও অনেক পশ্চিমে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি যে সৈন্য পাঠাইলেন, তাহাও নূতন, তাহাদের শিক্ষাও ভাল হয় নাই। এ দিকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রণশূর রাজা বাউরি, শুকলি, কোল প্রভৃতি জঙ্গলা জাতি লইয়া প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সেই সৈন্য লইয়া উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সন্ধিস্থলে যোগাস্থার মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করিতেছিলেন। উত্তর-রাঢ়ের সৈন্য নিকটে আসিয়া পঁহুছিলে, তিনি অতর্কিতভাবে

উহাদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। উত্তর হইতে তখন আর কোনও ভয় রহিল না। তখন ত্বরিত-গতিতে তিনি খড়ী নদী ও বল্লুকা নদী পার হইয়া পড়িলেন। নারিকেলডাঙ্গায় মনসা-মন্দিরের নিকট বাগদীরা তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু হটিয়া গেল। মানাদের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রণশূর জয়লাভ করিলেও আর আগাইয়া যাইতে পারিলেন না। কারণ, বাগদীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই তাহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের বাগদীরাজা যদি রণশূরের রাজ্য আক্রমণ করেন, সাতগাঁ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা নাবালক, আর তাঁহার অভিভাবকগণ আপনাপন লাভের চেষ্টায় আছেন। সাতগাঁয়ে সাহায্য করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। রণশূর এই সময়ে এক চাল চালিলেন। তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া দামোদর-ধারে পঁহুছিলেন। বাগদীরা তাড়া করিয়া আসিল। তাহারা বেশী লোক আনে নাই। তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিলেন। বাগদীরা কিন্তু মানাদের সব সৈন্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কারণ, ওদিকে নাউপালার খবর ভাল নহে। বরং রাজা পশ্চিম হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া তারাপুকুর রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। রণশূর যখন দেখিলেন, বাগদীরা চার পাঁচ দিন আক্রমণ করিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে আসিয়া তারাপুকুরের উত্তর কুন্তীনদীর উত্তরে তাম্বু গাড়িলেন। নদী পার হওয়া বিষম কঠিন। কারণ, ওপারে বাগদীদের অগণিত সেনা, রূপা-রাজা নিজে ও মেঘা দুর্গরক্ষা করিতেছে। হরিবর্ম্মা কিন্তু এখনও আসিয়া পঁহুছায় নাই। বাগদীরা হারিয়া আসিলেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে আর নৌকা ও লোক না আসিলে, তিনি আর আসিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে উড়িষ্যায় বেশ শান্তি ছিল। ভুবনেশ্বরে হরিবর্ম্মার যে সৈন্য ছিল, তাহারা আসিয়া সহসা রণশূরের সঙ্গে যোগ দিল। রণশূর কুন্তীপার হইলেন এবং তারাপুকুরের উত্তর দ্বার অবরোধ করিয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা বিফল হইল; শেষে বারুদ দিয়া রণশূর দ্বার উড়াইয়া দিলেন। দ্বার চাপা পড়িয়া রূপা-রাজা মারা গেল। মেঘা তখন তারাপুকুর ছাড়িয়া সাতগাঁ রক্ষা করিতে গেল। যেখানে প্রজাবিদ্রোহ, সে জায়গা রক্ষা করা দায়। সে পারিল না। রণশূর অনায়াসেই সাতগাঁ দখল করিলেন। মেঘা তখন মহাবিহারে আশ্রয় লইল।

মেঘা দুই তিন মাস ধরিয়া সদর্পে মহাবিহার রক্ষা করিল। রণশূর ধরমপুর বিহার অধিকার করিয়া তাহার চারিদিকে তাম্বু গাড়িয়া, উত্তরদ্বার আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু সে খাই পার হইতে পারিলেন না। দুই তিন মাসের পর হরিবর্ম্মা যখন সদলবলে গঙ্গা বহিয়া পূর্ব্বদ্বার আটকাইলেন, তখন মেঘা মহাবিহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া বিষ্ণুপুর প্রস্থান করিল। গুরুপুত্র মহাবিহারের চাবি হরিবর্ম্মার হাতে দিলেন। হরিবর্ম্মা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, ভবদেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মস্থানে কোন অত্যাচার

না হয়, সেটা আপনার দেখা উচিত। আপনি জানেন, আপনার পনর আনা প্রজা বৌদ্ধ। এটা তাহাদের ধর্ম্মস্থান। চাবি গুরুপুত্রের হাতে ফিরাইয়া দেন। গুরুপুত্র এত দিন রূপারাজার রাজ্যে বিহারের অধিকারী ছিলেন; এখন তিনি আপনার রাজ্যে বিহারের অধিকারী; বিহারের ভার তাঁহার হাতে যেমন ছিল, তেমনি থাকুক।"

৪

এ দিকে মায়া সব ভুলিয়া জীবন ধনীর যে মূর্ত্তি তৈয়ার হইতেছে, তাই দেখিতে লাগিল ও তাহাতেই তন্ময় হইয়া রহিল। ক্রমে পক্ষ মাস অতীত হইয়া গেল, মূর্ত্তি ঠিক জীবনধনীর জীবন্ত মূর্ত্তির মত দেখাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার গায়ে রঙ দেওয়া হইল। রঙটি ঠিক জীবন ধনীর যে রঙ ছিল, তাই। কেমন করিয়া কুমার সে রঙ ফলাইল, সেও ত চমৎকার। মায়াও বলিল, 'এই রঙ', ধাইরাও বলিল, 'এই রঙ'। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইতে একটু মাট রঙ। যখন রঙ ফলান হইল, চুল বসান হইল, মূর্ত্তি ঠিক হইল, তখন উহাতে ঘাম-তেল দেওয়া হইল। মূর্ত্তি যেন ঘামিয়াছে।

একদিন মস্করী আসিলেন। মস্করী বেশত্যাগ করিলেন; দেখা গেল, তিনি একজন বেশ সুপুরুষ। বয়স প্রায় ৬০ হইবে। শরীর বিলক্ষণ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতার গোছা ধবধব করিতেছে। পুরুষটি একটু দীর্ঘচ্ছন্দ। গোঁফ-দাড়ী একেবারে কামান। তাঁহার সঙ্গে আর একজন আসিয়াছেন—তাঁহার বয়স আরও অধিক। মাথায় একগাছিও কাল চুল নাই। শরীরের লোমগুলি পর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া এখনও লোল হয় নাই। চক্ষুর দীপ্তি যুবা পুরুষের মত, তবে চক্ষু দুটি একটু বসা। ইহাঁর বয়স ৯০ বৎসর হইবে। তান্ত্রিক কর্ম্মে ইনি অদ্বিতীয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তাই মস্করী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশেষ এটি ত শূদ্রের কার্য্য। মস্করী ভাল ব্রাহ্মণ, সে তাহা করিবে কেন? তাই তিনি একজন সাতশতী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছেন। এই মায়ার পৌরোহিত্য করিবে। ব্রাহ্মণের নাম বিধুভূষণ। ইহাঁর সাতশতী, গাঞীএর নাম ফর ফর; পুরা নামটি বিধুভূষণ ফরফর। লোকে ইহাঁকে ফরফর ঠাকুর বলিয়াই ডাকে। নব্বই বৎসর বয়স হইলেও ইনি ভারী হন নাই; ফরফর করিয়াই বেড়ান। ইহাঁর কাজ করিবার ক্ষমতার কিছুই হানি হয় নাই।

মস্করী ইহাঁকে আনিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবন ধনীর যে প্রতিমা গড়ান হইয়াছে, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে। তাহাকে কথা কহাইতে হইবে, ব্রাহ্মণও তাহারই উদ্যোগে আছেন। প্রথমতঃ কত জিনিসপত্র চাই, তাহার একটা হিসাব হইল। সব জিনিস বিধু ফরফর নিজে দেখিয়া লইতে লাগিলেন, কোনও জিনিসে কোনও ত্রুটী থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিতেছেন। গব্যঘৃত হোমের জন্য টাট্‌কা আনান

হইল। বিল্বদলগুলিতে দাগ থাকিবে না, ছেঁদা থাকিবে না, সবগুলিই ত্রিপত্র হইবে বেশী পাকা হইবে না, বেশী কচিও হইবে না। এমন বিল্বদল বাছিয়া বাছিয়া এক হাজার সংগ্রহ করা হইল। যজ্ঞডুমুরের এক হাজার আগডাল সংগ্রহ করা হইল। প্রত্যেকটীকে ঠিক বিতস্তি-প্রমাণ করিয়া কাটিয়া লওয়া হইল, আর তাহার আগায় দুএকটি কচি পাতা রহিল। পুষ্পপাত্রে ফুল সাজান হইল। তিন চার রকম চন্দন ঘষা হইল। বেলকাঠ, তুলসীকাঠ ঘষিয়া চন্দন করা হইল। আলোচাল, যব, তিল, আপাঙের গাছ, আপাঙের শিকড়, আপাঙের শীষ সংগ্রহ হইল।

প্রথম দিন বিধুভূষণ প্রাতঃকাল হইতেই পূজায় বসিলেন, শিবের ও কালীর পূজা করিলেন। সর্ব্বত্রই পূজা নিরুদ্বেগে শেষ হইল। কোন বাধা-বিঘ্ন বা অভাব হইল না। বেলা দুপরের পর ব্রাহ্মণ হোমে বসিলেন, একটি একটি করিয়া গণিয়া সমস্ত ত্রিপত্রগুলি গাওয়া ঘিয়ে ডুবাইয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। এক হাজার আহুতি শেষ হইলে, তিনি যজ্ঞডুমুরের পল্লব ধরিলেন। সেগুলিও একটি একটি করিয়া গণিয়া হোম করিলেন। যখন সব শেষ হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে উঠিয়া পূর্ণাহুতি দিলেন এবং তার পর মায়ার কপালে হোমের ফোটা দিয়া নিজে জলযোগ করিলেন।

আশায়, আনন্দে, ভয়ে, ভরসায় মায়ার দিনটি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে মূর্ত্তির সম্মুখে পূজা আরম্ভ হইল। ষোড়শ উপচারে হরপার্ব্বতীর পূজা হইল। তাহার পর জীবনের প্রতিমার পূজা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ষোড়শোপচারে জীবনের পূজা করিল; তাহার পর তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

৫

তাহার পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ঢাক-ঢোল কাড়া-নাগারা বাজিতে লাগিল। স্নান-আহ্নিক করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিলেন, ২।৩ দণ্ড নিশ্চল-নির্ব্বিকার-ভাবে ধ্যান করিয়া জপে বসিলেন। জপ শেষ হইলে রাশি রাশি ধূপ-ধূনা আগুনে দিতে বলিলেন। ধূপ ও ধূনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দীর্ঘদেহ গরদের কাপড়ে ঢাকিয়া জীবন ধনীর মূর্ত্তির বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—

ওঁং আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ—

মায়া নিকটেই বসিয়া ছিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিমা নড়িতেছে।

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিল—ওঁং আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ জীব ইহ স্থিত ঃ—

ব্রাহ্মণ আবার সেইরূপে প্রতিমার বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—ওঁং আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁং

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ জীবনস্য ধনিনঃ বাঘনঃশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণাঃ সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা বলিয়া ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল। মায়ার মনে হইতে লাগিল তাহার স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জীবিত। মায়ার ইচ্ছা—তাহার স্বামী কথা কন। সে ব্রাহ্মণকে কথা কহাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মস্করীর দিকে চাহিল। মস্করী ইসারা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল; প্রতিমার মুখে হাত দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ধূপ ধূনার ধোঁয়ায় ও গন্ধে ঘর পুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্র পড়িলে প্রতিমার ঠোঁট দুটি খুলিয়া গেল। বোধ হইল যেন, কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, "এই মায়া তোমার স্ত্রী, এ পতি বই আর জানে না। তোমার পূজায় তোমার স্মরণে জীবন ধরিয়া আছে। ইহাকে কিছু উপদেশ দাও, যাহাতে ও জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুখে থাকিতে পারে।" ঠোঁট আরও নড়িতে লাগিল—শেষে স্পষ্ট শুনা গেল, "মায়া পোষ্য পুত্রে ভাল হবে।" ঠোঁট দুটি বুজিয়া গেল। ধাইয়া বলিল, ঠিক যেন জীবনের স্বর, তবে যেন একটু নাকি সুরে কথা কহিল। মায়া ত মূর্চ্ছিত—সংজ্ঞাহীন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "স্বামীর কথা মাথায় করিয়া লইলাম।" সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আবার বলিল, "তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" মায়া এমন স্থিরভাবে এই কথাগুলি বলিল; বোধ হইল যেন, তাহার বুকের উপর একটা পাথর বসান ছিল, সেটা সরিয়া গেল; যেন তাহার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বোঝা ছিল, সেটা নামিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ বলিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর সকলে চলিয়া গেলে মস্করীকে ডাকিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছেন, আর একটিবার একটু কষ্ট করুন। এটি মাটীর মূর্ত্তি। এইরূপ একটি অষ্টধাতুর মূর্ত্তি করিয়া দিন, আমি তাহা আমাদের গোলাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিব ও স্বামীর আজ্ঞামত একটি পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে লালন পালন করিব।" হঠাৎ যেন মায়ার মুখ থেকে সেই পুরাণ বিষাদের ছায়াটা সরিয়া গেল। তাহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে যেন একটা নূতন স্ফূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

মস্করী বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহাই করিয়া দিব। কিন্তু এখানকার ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল; এখন আমরা গোলাবাড়ী ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করি।"

মায়া বলিল, "অষ্টধাতুর মূর্ত্তি কবে হবে?"

মস্করী বলিল, "সেইখানেই হবে।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

১

মহাবিহারের পূর্ব্বদিকে গঙ্গার উপর একটা প্রকাণ্ড পরিষ্কার ঘাসের জমীতে একটা প্রকাণ্ড পা'ল খাটান হইয়াছে। পা'লের নীচে দক্ষিণদিকে ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার সিংহাসন, তাহার উপর চাঁদোয়া; আর দুই পাশে দুইখানা রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের নীচে ও তাহার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গালিচা পাতা, গালিচারও উত্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সতরঞ্চি পাতা, তাহারও উত্তরে মাদুর, চট ইত্যাদি পাতা। চারিদিকে পাহারা; ঢাল-তলবার লইয়া অনেক লোক পাহারা দিতেছে। বেলা তিনটার সময় তথায় পাহারাওয়ালা ভিন্ন আর একটিও লোক ছিল না। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, অসংখ্য লোক নানা দিক্ হইতে আসিয়া কেহ গালিচায় কেহ সতরঞ্চে কেহ বা মাদুরে বসিতে লাগিল। বহুসংখ্যক নৌকা গঙ্গার ও দিকের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা নানারূপে ঘোরাল রং দিয়া সাজান। সবগুলিতেই ধ্বজা, পতাকা উড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি বড় নৌকা পার হইয়া মহাবিহারের ঘাটে লাগিল। ঘাটে সকলের নীচের ধাপ পর্য্যন্ত লাল বনাত পাতা ছিল। নৌকা হইতে সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল। সিঁড়ি বহিয়া তিন জন লোক নামিয়া বাঁধা ঘাটের ধাপে উঠিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে "মহারাজের জয়" "মহারাজ হরিবর্ম্মার জয়" "বঙ্গাধিপের জয়" ধ্বনি উঠিল। তাহাতেই বুঝা গেল যে, যাঁহার মাথায় মুকুট ও যাঁহার গায়ে নানা হীরা-মতি জড়ওয়া গহনা, ঘোরাল রঙের রেশমী কাপড়, তিনি মহারাজ হরিবর্ম্মা। তাঁহার সহকারী একজন গরদের ধুতি ও চাদর পরিয়া আসিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ভবদেব ভট্ট। আর একজন রাজবেশধারী তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা।

রাজা সিঁড়ির ধাপে উঠিবামাত্র সৈন্যগণ দুইধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। ভাটেরা রাজার যশোগান করিতে লাগিল। সকলেই মাথা নোয়াইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিল। ঘাটের উপরের চাতালে সাতগাঁবাসীরা সকলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল—সকলে রাজাকে নমস্কার করিল। রাজা কাহারও সঙ্গে একটি কথা কহিলেন, কাহাকেও "ভাল আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে একটু হাসিয়া আপ্যায়িত করিলেন, কেহ বা প্রণাম করিতে আসিলে তাহার পিঠে হাত দিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহারী দত্তকে দেখিতে পাইয়া রাজা হাত বাড়াইয়া দিলেন, সে তাঁহার হাত ছুঁইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। এইরূপে সকলকে সম্ভবমত আপ্যায়িত করিয়া রাজা স্বর্ণসিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। ভবদেব ও রণশূর দুইখানি রূপার সিংহাসনে বসিলেন। রাজা ভবদেব

ভট্ট মহাশয়কে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। ভবদেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

"মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব এবং তাঁহার মিত্রবর্গ এই সাতগাঁ রাজ্য যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ দেবের রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মহারাজাধিরাজ প্রজাদিগকে অভয়দান করিতেছেন যে, যদি তোমরা শান্তভাবে থাকিয়া আপন আপন জীবন যাপন কর, তোমাদের ধন, মান, দেহ, মন তিনি প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। যে সকল বাগদীরা যুদ্ধ করার জন্য ভূমি ভোগ করে, তাহারা যদি নূতন রাজার সহিত সেই বন্দোবস্তে চলে, তাহাদের ভূমিতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যাঁহারা যে ধর্ম্মেই থাকুন, যদি রাজার রাজবিধি মানিয়া চলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে নূতন রাজা হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ যে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভার যাঁহাদের উপর আছে, তাঁহাদের উপরেই থাকিবে। তাঁহারা যেমন রূপনারায়ণের অধীনে থাকিতেন, আমাদের মহারাজের অধীনেও তেমনই থাকিবেন। তাঁহারা যে ৫০টি গ্রাম ভোগ করিতেছিলেন, তাহাই করিবেন; তবে তাহার মধ্যে ৩০টি গ্রাম আমাদের পাট্টা করিয়া দিতে হইবে। আমরা তাহার যথাযোগ্য রাজস্ব মহাবিহারের অধ্যক্ষকে দিব। আর যত দিন মিত্রবর্গের মধ্যে সাতগাঁ রাজ্য ভাগ না হয়, তত দিন শ্রীযুত বিহারী দত্ত এই রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তাহার পর ভাগ হইয়া গেলেও, আমাদের মহারাজাধিরাজ যে অংশ পাইবেন, তাহার সম্পূর্ণ ভার বিহারীর উপরই দেওয়া থাকিবে। এইখান হইতেই তোমরা বিহারী দত্তকে রাজার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবে এবং তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান করিবে। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার মিত্রবর্গ টীকা লইবার জন্য শ্রীযুত বিহারী দত্তকে আহ্বান করিতেছেন।"

পরে কয়েকজন ভাট গিয়া যশোগান করিতে করিতে বিহারীকে দুজন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রথমে হরিবর্ম্মদেব ও পরে রণশূরদেব উহার কপালে কুঙ্কুম ও চন্দনের টিপ পরাইয়া দিলেন।

২

বিহারীর রাজ-পদ-লাভে বেণেরা মহা আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। সাতগাঁয়ের সকল লোকই তাহাতে যোগ দিল। সাতগাঁ ভাটেদের প্রধান জায়গা। তাহারাও মহা আনন্দে তাহাতে যোগ দিল।

এমন সময়ে খবর আসিল যে, বিহারী দত্তের কন্যা মায়া তাহাদের গোলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খবর শুনিয়া বিহারীর ত আনন্দ ধরে না। তিনি মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, ও ভবদেব ভট্টের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ মঙ্গলই মঙ্গলের অনু-

বন্ধী। এত দিনের পর আমার কন্যা আপন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন, আমি গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

ভবদেব বলিলেন, "সে ত সাতগাঁয়েরই মেয়ে, এই উৎসবের সময় তাহাকে এখানে আনিতে দোষ কি?" সকলেই অনুমতি দিলে মহারাজাধিরাজ তাহাকে সভাস্থলে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সেই মস্করী। মস্করীকে দেখিয়াই ভবদেব তাহাকে চিনিলেন। সে চতুর্থ খণ্ডের পাড়া পিশাচ খণ্ডের গাঞী। মস্করীকে ডাকিয়া তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, মস্করী বলিল, "ভিখারিণীরা মায়াকে ভুলাইয়া যখন সঙ্ঘে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, রূপা-রাজা উহাকে গুরু-পুত্রের শক্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর বিহারী ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, সে সময়ে আমি সাতগাঁয়ে আসিয়াছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। সে একান্ত পতিপ্রাণা। পতির ছবি সে প্রত্যহ পূজা করে, পতির কাপড়, চাদর, জুতা সে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। আমি মস্করী সাজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পাছে সন্দেহ করে, তাই বিহারে বিহারেই থাকিতাম। মায়াকে স্বামীর সহিত দেখা করাইব, কথা কহাইব বলিয়া তাহাকে লইয়া পিশাচখণ্ডে লুকাইয়া রাখি; তথায় ভাল ভাল কুমার আনাইয়া তাহার স্বামীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাই। তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাই। প্রতিমা কথা কহিয়া বলে—মায়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর। স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি মায়ার বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমি এমন পতিভক্তি দেখি নাই।"

মস্করী অথবা পিশাচখণ্ডের গাঞীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই মায়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। স্থির হইল, বিহারী সাতগাঁ রাজ্যে শান্তি-স্থাপনের পরই নিজেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে, মায়াকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাইবে। পোষ্যপুত্র গ্রহণ ভবদেব ভট্টের পদ্ধতিমতে হইবে। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে সভাভঙ্গ হইল। রাজারা নৌকায় উঠিলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল, "মহারাজা হরিবর্ম্মার জয়", কেহ বলিল, "রণশূরের জয়," কেহ বলিল, "বিহারী দত্তের জয়", কেহ কেহ বা বলিল, "ভবদেবের জয়," কেহ কেহ বা বলিল, "জয় মায়াদাসীর জয়!"

৩

বিহারীর প্রতাপে সাতগাঁয়ে শান্তি হইল। বাগদীরা কেহ কেহ হরিবর্ম্মার প্রজা হইয়া তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইল। কেহ কেহ বা বিষ্ণুপুরে চলিয়া গিয়া মেঘার সঙ্গে যোগ দিল। বিহারীর সুবিচারে প্রজারা রাজার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। বিহারী শালাকে পোষ্যপুত্র লইল। মায়া একটি ধনীর ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইল, এবং আপনার হৃদয়ের

যত স্নেহ-মমতা ছিল, সব তাহারই উপর দিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে লাগিল। একে স্বর্গীয় স্বামীর আজ্ঞা, তাহাতে নিজের নাম-গোত্র রক্ষা হইবে, এই আশা, এদুয়ে মিশিয়া তাহাকে আনন্দময়ী করিয়া তুলিল। সব হইল, তাহার বিষাদটুকু কোথায় চলিয়া গেল। সে রাজকন্যা হইয়া প্রজাপালনে পিতার প্রধান সহায় হইল। ক্রমে তাহার স্বামীর অষ্টধাতুর মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল। একটি সুন্দর মন্দির করিয়া তাহাতে মায়া সে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

গুরুপুত্র গুরুদেব কবে আসিবেন, ভাবিয়াই অস্থির হইলেন। শেষে লুইসিদ্ধা আসিলে তাঁহার হাতে মহাবিহার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং মহাযান শিক্ষার জন্য সুবর্ণদ্বীপে চলিয়া গেলেন। লুই দারিক নামে তাঁহার প্রধান ও প্রবীণ চেলার হাতে মহাবিহারের ভার দিয়া ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইলেন। আপনার গ্রামগুলি বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দারিক যে জাঙ্গাল বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কোন্নগরের নিকট আজিও দারিকের জাঙ্গাল বলিয়া বিখ্যাত আছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ব্রহ্মসমাজের কথা

রামমোহন ও তাঁহার পন্থা

বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দিয়া কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোন নূতন সমাজেরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। রাজা কতকগুলি মতবাদ এবং সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র; আর দেশের অবস্থা বুঝিয়া, সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের লোকে যাহাতে একত্র মিলিত হইয়া সকলে যাঁহাকে জগতের সৃষ্টি ও নির্ব্বাহকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, সেই নামরূপবর্জ্জিত পরমতত্ত্বের বা পরম-পুরুষের ভজনা করিতে পারে এবং এই ভাবে পরস্পরের মত, বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের প্রতি মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার হিংসাদ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক জন্মভূমির কল্যাণ ও লোকশ্রেয়ঃসাধনে একে অন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে, রাজা এই উদ্দেশ্যে একটি ভজনালয় মাত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজার চেষ্টার অন্তরালে একটা গভীর স্বদেশাভিমান জাগিয়াছিল।

রাজার জীবনে নানাদিক্ দিয়া এই স্বদেশাভিমান ফাটিয়া পড়িয়াছিল। আজিকালি আমাদের স্বদেশাভিমান রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যেই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, আজিকালি রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধেতেই স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। রাজার সময়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের সূচনা পর্য্যন্ত হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের তখনও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। তখন স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের প্রতিযোগিতা ছিল ধর্ম্ম লইয়া। ইংরাজ পাদ্রিরা তখন সবে এ দেশে আসিয়া আস্তানা পুতিয়াছেন। কেরি-মার্শম্যান্ এবং বার্ড, ইঁহারা শ্রীরামপুর হইতে সংবাদপত্র ও পুস্তিকাদি প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। রাজা স্বয়ং প্রতিমা-পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচলিত প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজের সঙ্গে তখন তাঁহার তুমুল লড়াই বাধিয়াছে। রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় দল বাঁধিয়া রামমোহনের প্রতিপক্ষতা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যখন হিন্দুধর্ম্মের উপরে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, হিন্দু-দিগকে পৌত্তলিক কুসংস্কারসমাচ্ছন্ন বলিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতের সভ্যতা, সাধনা ও সমাজকে হীন করিয়া, খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের, খ্রীষ্টীয়ান্ সভ্যতা, সাধনা

ও সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রাজা রামমোহনের স্বদেশাভিমানে নিদারুণ আঘাত লাগিল। অমনি তিনি "ব্রাহ্মণ-সেবধি" নাম দিয়া এক সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার মূল কথা এই—তোমরা হিন্দুর কি জান? তোমরা হিন্দুর কি বুঝ? হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের বিচার করিবার তোমরা কে? তোমাদের কি অধিকার আছে? আর হিন্দুকে পৌত্তলিক কহিতেছ, তোমরা নিজেরা কি? তোমরাও ত পৌত্তলিক। তোমাদের রোম্যান্ ক্যাথলিকেরা যিশুর ও যিশুর মাতা মেরীর মূর্ত্তি রচনা করিয়া নিজেদের গির্জ্জায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপদীপ জ্বালিয়া দেয়। আর প্রোটেষ্ট্যান্টেরা ইহা করে না বটে, কিন্তু তারাও ত ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে যিশুর পূজা করে। হিন্দুরা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে অবতার জ্ঞান করে ও ঈশ্বর ভাবিয়া ইহাদের পূজা-অর্চ্চনা করে। খ্রীষ্টীয়ানেরাও তাই করে। ইহারা দেবতার নিকটে পার্থিব খাদ্যের নৈবেদ্য দেয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা রুটি ও সুরা দিয়া "প্রভুর ভোজ" দেয়। বেশ-কম কোথায়? এইরূপ ভাবে রাজার গভীর স্বদেশাভিমান, শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের স্পর্দ্ধার প্রতিবাদ করিয়াছিল। তাঁর ব্রাহ্মণ-সেবধি পড়িলে, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের সংস্কারক রাজা রামমোহনের প্রাণে হিন্দুর প্রতি কতটা মমতা ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

রাজা হিন্দু নাম পরিহার করিয়া ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করেন নাই, হিন্দুধর্ম্মও বর্জ্জন করেন নাই। প্রচলিত তথাকথিত পৌত্তলিকাতেই হিন্দুর ধর্ম্ম শেষ হয় নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই একদল লোক ছিলেন, যাঁরা যাগযজ্ঞ মানিতেন না, জাতিবিচার করিতেন না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণ করিতেন না, অথচ যাঁরা গৃহী ছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অত্যাশ্রমী হন নাই। ইঁহারাও হিন্দু ছিলেন। ভারতের আর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুর সাধনা দুই শাখায় ভাগ হইয়া পড়িয়াছিল; এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞানকাণ্ড। যাগযজ্ঞ, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ, শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত ছিল। কর্ম্মকাণ্ডী বা কর্ম্মপন্থীদিগকেই এ সকল মানিয়া চলিতে হইত। জ্ঞানকাণ্ডে এ সকলের অধিকার ছিল না। জ্ঞানপন্থীরা এ সকল বাঁধাবাঁধির ভিতরে ছিলেন না। উপনিষদের যুগ হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম এই দুই খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কালবশে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে; কিন্তু জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের ভেদ কখনও একেবারে লোপ পায় নাই। এই জন্য রাজার মতবাদ ও আচারব্যবহার কিছুই বিশাল ও উদার হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত হয় নাই। আর এই কথা জানিতেন ও বুঝিতেন বলিয়াই রাজা একটা অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন বা এই ধর্ম্মের অনুযায়ী একটা নূতন সমাজ গড়িতে যান নাই। তার পর, রাজা মোটের উপরে শঙ্কর-বেদান্তের মতবাদকে আশ্রয় করিয়াই প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এখানেও রাজা একটা নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কোনও কোনও বিষয়ে রাজা শঙ্করকে

অতিক্রম করিয়াছেন, হয় ত এ কথা সত্য হইতেও বা পারে। আমি নিজে এখনও এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার অধিকারী নহি। কিন্তু রাজা শঙ্কর-বেদান্তের প্রতিকূল, নিম্বার্ক, মাধ্ব বা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব-বেদান্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য রাজাকে শঙ্কর-বেদান্তাবলম্বী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। আর এই জন্যও রাজাকে "একটা নতুন কিছু" করিবার চেষ্টা পাইতে হয় নাই।

শেষ কথা—রাজা নিজের সাধন-ভজনে তন্ত্রের পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, রাজার জীবনী-লেখক, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ৺ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজা হরিহরানন্দ স্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কেবল ভিতরকার সাধনভজনে নয়, বাহিরের আচার-আচরণেও রাজা তন্ত্রের পথ ধরিয়া চলিতেন। সুরাপান, শৈববিবাহাদি সম্বন্ধে রাজা নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এ কথার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিজের মুক্তির জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্মবস্তু লাভের জন্য, কালবশে প্রাচীন সত্যের সঙ্গে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ মিশিয়া পড়িয়াছে, তাহার শোধনের জন্য,—রাজা যা-কিছু চাহিয়াছিলেন, তার সমুদায়ই যখন স্বদেশের শাস্ত্র, সাধনা ও সদাচারের মধ্যে পাওয়া যায়, তখন তাঁর পক্ষে নূতন করিয়া একটা ধর্ম্মের বা সমাজের পত্তন একান্তই অনাবশ্যক ছিল। এই কারণেই রাজা রামমোহনকে আমাদের মতন "ব্রাহ্ম" হইতে হয় নাই।

আমাদের সঙ্গে রাজার প্রভেদ বিস্তর। কেবল "আধ্যাত্মিক" ব্যথার জোরে, রাজা রামমোহনকে আমাদের মতন ব্রাহ্ম করা সম্ভব নয়। চেষ্টাটাই সঙ্গত হইবে না।

আমরা শাস্ত্র মানি না। কোনও অর্থেই মানি না। আমরা বলিয়াছি—"সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং", অনশ্বর সত্যই শাস্ত্র, অথবা সত্যই অনশ্বর শাস্ত্র। কিন্তু এই সত্যের প্রামাণ্য কি? এই প্রশ্ন উঠিলেই আমাদিগকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। ইহার মামুলী উত্তর— "আমার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই সত্য।" কিন্তু এ প্রতীতির উপর নির্ভর করিয়া চলা যায় কি? অনেক সময় ত অনেক অসত্যও আমার নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। সুতরাং আমার এই পরিবর্ত্তনশীল প্রতীতির প্রামাণ্যে "অনশ্বর" বা অপরিবর্ত্তনীয়, অথবা সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় কিরূপে? তার পর, আরও গোল বাধে। আমার প্রতীতির সঙ্গে ত সর্ব্বদা অপরের প্রতীতির মিল হয় না। আমার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, অপরের নিকটে তাহা অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাও ত নিয়তই দেখিতেছি। এ ক্ষেত্রে, আমার প্রতীতিই সত্য, বা তাদের প্রতীতি সত্য; ইহার মীমাংসা করে কে? মহর্ষি ইহা বুঝিয়াছিলেন। কেবল স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহাতে যে সত্যের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লোপ পাইয়া যায়,

তিনি ইহা দেখিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পুস্তকখানিকে শেষে ব্রাহ্মগণের শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কথা পরে কহিতে হইবে, এখানে ইহার উল্লেখমাত্রই প্রাসঙ্গিক; বিচার-আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

রাজা গুরু মানিতেন। হরিহরানন্দ স্বামীর নিকটে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছিলেন। আমরা গুরু মানি না। ব্রাহ্ম হইয়া "গুরুকরণ" করিলে, আমাদের ব্রাহ্মত্বের মর্য্যাদা থাকে না।

রাজা জাতি-বিচার করিতেন। বিলাত যাইবার মুখে মিস্ আডাম্‌স্ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি বিলাত যাইয়া জাতি রাখিবেন কিরূপে?" রাজা উত্তর করেন—"জাতির বন্ধনের অতীত হওয়া আমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই, আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অতীত হইতে পারি। হিন্দু সন্ন্যাসীর জাতি মানা বিহিত নয়।" কিন্তু আমরা জাতিভেদ মানি না।

সুতরাং রাজা রামমোহন যদি আজ ফিরিয়া আসেন, আর এই ৮৬ বৎসরে যদি তাঁর মতবাদে বা সিদ্ধান্তে কোনও যুগান্তর উপস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আদর হওয়া ত দূরের কথা,স্থান হইবে কি না, তাহাই সন্দেহ। অথবা সন্দেহই বা বলি কেন? বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের আমলাতন্ত্র তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবেন না, ইহাই স্থির-নিশ্চিত। না করিলে, কোন দোষের কথাও হইবে না, বরং করিলেই "সত্যনাশ" হইবে—নামের খাতিরে, পদের খাতিরে, গরিব নগণ্য লোকের জন্য যে বিধান, রাজার জন্য সে বিধান থাকিবে না।

রাজাকে নাকি ঠিক আমাদের মতন "তিনসত্য"-বাদী ব্রাহ্ম করিয়া তুলিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই হয়। এই চেষ্টাতে সত্যেরও মান থাকে না, রাজারও মর্য্যাদা থাকে না, আর আমাদেরও আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়। এই জন্যই আমরা যে জাতীয় ব্রাহ্ম, রাজা রামমোহন যে সেই জাতীয় ব্রাহ্ম নহেন, এই কথাটা এমন করিয়া প্রমাণ ও প্রচার করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমরা যা-কে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া জানি, রাজার মতবাদ ও সাধনের ক্রমাভিব্যক্তিতে তাহার প্রকাশ হয় নাই। রাজা বৈদান্তিক হিন্দু ছিলেন। বেদান্তে সগুণ ও নির্গুণ দুই উপাসনাই বিহিত আছে। কিন্তু বেদান্ত "সগুণ" বলিতে "সাকার" বুঝে না। রাজা যে বেদান্ত-মত অবলম্বন করিয়া আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'নির্গুণ' বলিতে হেয়-গুণবর্জ্জিতও বুঝায় না। রাজা "নির্গুণ" উপাসনা বলিতে প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ-উপাসনাই বুঝিতেন। সমাধির অধিকার যাহাদের আছে, তারাই কেবল এই "নির্গুণ" বা স্বরূপ-উপাসনা করিতে পারে, ইহাও তিনি স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন। যাহাদের এই সমাধির অধিকার জন্মে নাই, অর্থাৎ যাহারা সাধন-বলে এতটা ধ্যানের শক্তিলাভ করে নাই যে, ধ্যান-কালে ক্রমে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বহিরিন্দ্রিয়-চেষ্টা

কেবল নহে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তার বৃত্তি-সমূহ পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তাদের পক্ষে রাজা অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের চিন্তা করিয়া, যে অনন্ত ও স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার দ্বারা এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে, তাহার মনন করাই সত্য উপাসনা, এ কথাও কহিয়াছেন। এই যে 'কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার' চিন্তা করা, ইহাই র জার মতে সগুণ-উপাসনা। বিশ্ব কার্য্যে যে ব্রহ্মের সন্ধান পাই, সেই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় সত্ত্বঃ,রজঃ,তমঃ এই তিন গুণের সমষ্টি। এই জগৎকে এই কারণে ত্রিগুণাত্মক বলা হয়। শাস্ত্রে গুণ বলিতে এই তিন গুণকেই বুঝায়। এই গুণত্রয়ের সঙ্গে যাহা যুক্ত বা প্রকাশিত, তাহাই সগুণ। ব্রহ্মকে যখন সগুণ বলা হয়, তখন তাঁহাকে এই বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তারূপে দেখা হয়। বেদান্তসূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া এই ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা যে উপাসনা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জগতের জন্ম-আদি দেখিয়া যে ব্রহ্মের প্রতীতি হয়, তাঁহারই ভজনা করিবে; জগৎ-রচনা চিন্তা করিয়া, জগৎপালয়িতার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে; আর এই ভজনার সঙ্গে'সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্যাদি সাধন করিয়া ক্রমে সমাধির ও স্বরূপ উপাসনার অধিকার লাভে যত্নবান্ হইবে,—ইহাই রাজার ধর্ম্মের ও সাধনের মূল কথা।

রাজার সমকালে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে এই কথাটা বলারই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। তত্ত্ব-বিচার লোপ পাইয়াছিল। লোকে বেদের দোহাই দিত, কিন্তু বেদের খবর জানিত না। পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বেদান্তবিদ্যার অনুশীলন করিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিত, কিন্তু ব্রহ্ম-বস্তু যে কি আর ব্রহ্মের জ্ঞানই বা কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহার সন্ধানও কেহ জানিত না, আলোচনাও কেহ করিত না। লৌকিক উপাসনা অত্যন্ত সকাম ও তামসিক হইয়া উঠিয়াছিল। গীতা চারি শ্রেণীর উপাসকের কথা কহিয়াছেন।

> চতুর্ব্বিধাঃ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন !
> আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ !

চারি শ্রেণীর সুকৃতিসম্পন্ন লোকেরা আমার ভজনা করে। প্রথম —যারা আর্ত্ত, অর্থাৎ চৌর-ব্যাঘ্রাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয়—যারা জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ যাদের মনে আমি কি, আমার স্বরূপ কি, জীবন কি, মৃত্যু কি, সংসার কি, এ সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং এ সকলের মীমাংসার জন্য যারা আকুল হইয়াছে। তৃতীয়—যারা অর্থার্থী রূপ, যশ, ধনপুত্রাদি অথবা স্বর্গ, মুক্তি প্রভৃতি যারা কামনা করে। আর চতুর্থ—যারা জ্ঞানী অর্থাৎ যারা আমি কি, আমার স্বরূপ কি, ইহা জানিয়াছে, এবং আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবগত হইয়া, চক্ষু যেমন রূপের

পানে ছুটে, পিপাসু যেমন জলের দিকে ছুটে, ক্ষুধিত যেমন খাদ্যের প্রতি ধাবিত হয়, যাদের চিত্ত, সেইরূপ আমার জন্য লালায়িত হইয়া আমার অনুসরণ করে। এই চারি প্রকারের উপাসকের মধ্যে ভক্তিবিশিষ্ট এই জ্ঞানী-উপাসকই শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানীদিগকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না, এই জ্ঞানীরাও কখনও আমাকে পরিত্যাগ করে না। এই নিত্যযুক্ত জ্ঞানী সাধকদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে সহজে লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রাজার সমকালে এ দেশে কেবলমাত্র আর্ত্ত এবং অর্থার্থী উপাসকই ছিল। কেহ বা বিপন্ন হইয়া দেবতার নিকটে মানত করিত; কেহ বা ভবিষ্যৎ বিপদের ভয় হইতে পরিত্রাণের জন্য শীতলা, মনসা প্রভৃতির পূজা করিত; আর কেহ বা "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" বলিয়া কালী, দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা করিত। সাধারণ লোকের এই অবস্থা ছিল।

এ অবস্থায় রাজা যে কাজটি করিয়াছিলেন, তাহাই অত্যাবশ্যক ছিল। এরূপ অবস্থায়, প্রথম কর্ত্তব্য লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করা। সন্দেহ না জাগিলে, জিজ্ঞাসার জন্ম হয় না। এই সন্দেহই অনুভব-প্রতিষ্ঠ যে জীবন্ত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধন, তাহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। এই সন্দেহ জাগাইবার জন্যই রাজা বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রচারে প্রবৃত্ত হন। পরস্পর-বিরোধী উপদেশের বা মতবাদের সম্মুখীন না হইলে সন্দেহ জাগে না। দেশের লোকে প্রচলিত ধর্ম্মের ও ধর্ম্মব্যবসায়ীদের মুখে এক প্রকারের উপদেশ শুনিয়া আসিতেছিল। এই সকল ধর্ম্ম-উপদেশও বেদের দোহাই দিত। এ সকলও বেদ-মূলক বলিয়া প্রচারিত হইত। সুতরাং বেদে সত্য সত্য কি উপদেশ দেয়, এই কথা প্রচার করিলে ও এই বেদোপদেশের সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মোপদেশের বিরোধ দেখাইতে পারিলেই, লোকের মনে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টাই বা বেদ-সম্মত বা শাস্ত্রসম্মত, এই সন্দেহ জাগিবে, এবং এরূপ সন্দেহের মুখেই একটা জীবন্ত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারিবে। রাজা এইটি দেখিয়া শুনিয়াই বেদান্তাদি প্রাচীন শাস্ত্রের বহুল প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এ দেশে একটা নূতন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগাইয়া তোলাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল কিন্তু তিনি কেবল একটা তর্ক তুলিয়াই নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই। আমাদের দেশে কোনও দিন সাধনবিহীন তত্ত্ববিচারের মর্য্যাদা ছিল না। এরূপ বিচারকে প্রাচীনেরা জল্প, বিতণ্ডা প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। নিরর্থক বাক্যব্যয়কে জল্প কহে। মিথ্যা-বিচারের নাম বিতণ্ডা। সাধনবিহীন বিচারে সত্যের ও তত্ত্বের প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা হয় না। এই জন্য ইংরাজিতে যাহাকে speculation কহে, বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই, কেবল মানসিক কসরৎ দ্বারা সত্যলাভের যে প্রয়াস, আমাদের দর্শনে ও তত্ত্ববিচারে তাহার কোনও স্থান এবং মর্য্যাদা কোন দিন ছিল না। এই জন্য রাজা, একদিকে যেমন সন্দেহ জাগাইয়া একটা জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ

অন্যদিকে, যে সাধন ব্যতীত এই জিজ্ঞাসার ফলে যে-বিচারাদির সূত্রপাত হইবে, তাহাতে সত্যের ও বস্তুর প্রতিষ্ঠা কদাপি সম্ভব হয় না, ইহা বুঝিয়া সেই সকল সাধনও প্রচার আরম্ভ করিলেন। বিবেক, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব এবং শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন। এই জন্য রাজা একদিকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ জগতের জন্মস্থিতিলয় যাহা হইতে হয়, এই সূত্র অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিলেন, আর একদিকে ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন উপদেশ করিলেন। রাজার গ্রন্থাদি পড়িয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

এখন প্রশ্ন এই—এই যে বীজ রাজা এ দেশে বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কি আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি সম্ভব? রাজার পথ ধরিয়া কি এখানে পৌঁছা যায়?

রাজার পথ ছিল, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। রাজার নিজের সাধনে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান একটা বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত ধরিয়া, একটা বিশিষ্ট সাধের সন্ধানে গিয়াছিল। তিনি নিজে কৈবল্য-মুক্তির পথে চলিয়াছিলেন। আমাদের তান্ত্রিক সাধনমাত্রেই কৈবল্য-সিদ্ধির প্রয়াসী। কিন্তু রাজা যে সিদ্ধান্ত ও সাধন প্রচার করেন, তাহাতে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সাধনাটি পরিস্ফুট হয় নাই। বৈষ্ণববেদান্ত ও শাঙ্কর-বেদান্ত উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। উভয়েই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র ধরিয়া ব্রহ্ম মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। উভয়েই বিবেক, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব এই সাধন-চতুষ্টয় ও শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন বলিয়া স্বীকার করেন। এই পর্য্যন্ত তান্ত্রিকে বৈষ্ণবে, জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে কোনও বিরোধ নাই। রাজা যে সিদ্ধান্ত ও সাধন লোকসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই সামান্য ধর্ম্মটিই খুব পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজার ধর্ম্মপ্রচার যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—তাহার সম্মুখে দুইটি পথ প্রশস্ত ছিল। এক শঙ্কর-বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদের এবং কৈবল্য-মুক্তির পথ; অপর বৈষ্ণব-বেদান্তের ভাগবত-তত্ত্বের এবং ভক্তির পথ। রাজা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেবলমাত্র এই দুইটি চারা জন্মিতে পারিত। রাজার পরে ব্রহ্মসমাজ যদি সত্য সত্য রাজার পথ ধরিয়া চলিতেন, তাহা হইলে হয় তাঁহাকে বৈদান্তিক কৈবল্যবাদী, না হয়, বৈষ্ণব-ভক্তিবাদী হইতে হইত। ব্রহ্মসমাজ এই দুইটির কোনওটিই হন নাই। রাজার পরে ব্রহ্মসমাজ বেদান্তের পথ একেবারে বর্জ্জন করিয়া ঊনবিংশ খ্রীষ্ট শতাব্দির মধ্যভাগে খ্রীষ্টীয় জগতে যে খ্রীষ্টবর্জ্জিত একেশ্বরবাদের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহাকেই বরণ করিয়া আনিয়া, রাজার প্রতিষ্ঠিত "ভজনালয়ে" বা Prayer House স্থাপন করেন। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত রাজা রামমোহন নহেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

আমরা যে জাতীয় ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহাদের উৎপত্তি রামমোহন হইতে নয়,

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ হইতে। কথাটা বারান্তরে খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। তবে একটা কথা এখানেই বলিয়া রাখা ভাল,—ইহাতে রাজারও মহত্ত্বের হানি হয় না, মহর্ষিরও মর্য্যাদা বা তিনি যে কাজটি করিয়া গিয়াছেন, তার মূল্য বিন্দুপরিমাণেও হ্রাস হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

পাগলের কাণ্ড।

১
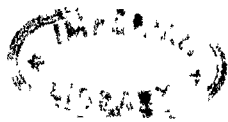
তারণ ভট্‌চাজ্জির ভাই সারদা ভট্‌চাজ্জি মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল, এম এস উপাধি লইয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন সাপ্তাহিক পাশার আড্ডাটা দৈনিক ভাবে জমিবে বলিয়া যজ্ঞেশ্বর দত্ত এক জোড়া নূতন ছক্‌ কিনিয়া আনিল। তারণ ভট্‌চাজ্জি কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি এবং ডেলী প্যাসেঞ্জারির মায়া ত্যাগ করিয়া দৈনিক পাশার আড্ডার দিকে আদৌ মনোযোগ দিল না।

বন্ধুবান্ধবেরা বলিল, "আর কেন ভট্‌চাজ, কষ্ট ক'রে ভাইকে মানুষ কর্‌লে, এখন দিনকতক ব'সে তার রোজগার খাও।"

তারণ হাসিয়া উত্তর করিল "খাব বৈকি ভায়া, খাব বৈকি; তবে যে কয়টা দিন চলে চলুক।"

লোকে তারণ ভট্‌চাজ্জিকে শুধু একটু মাথা-পাগলা বলিয়াই জানিত, এখন তাহাকে কৃপণ স্বভাব বলিয়াও জানিতে পারিল।

কেবল বাহিরের লোকে নয়, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীও সাতটায় ভাত তৈরী করিয়া দিতে অসমর্থ জানাইয়া তিরস্কারের ছলে স্বামীকে বলিল, "ভাল, চিরকালটাই কি সাতটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজে গাড়ী ধর্ত্তে ছুটবে? ঠাকুরপো যখন দু'পয়সা আন্‌বে, তখন তোমার আর এই ক'টা টাকার তরে ছুটাছুটি কেন?"

তারণ ইহাতে উত্তর দিল, "কি জান বড় বৌ, ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া আর কেরাণী ছুট্‌লেই ভাল থাকে।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি কর, আমি কিন্তু আর সাতটায় ভাত দিতে পার্‌বো না। কেন, আমার কি বেঁচে সুখ নাই।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করা যাক, এই টাকা দিয়ে একজন রাঁধুনি আর একটা ঝি রাখা যাক্‌। এতকাল রেঁধে খাওয়াচ্ছ, দিনকতক রান্না ভাত খাও।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বড় বৌ বলিল, "ইস্‌, আমার উপর আর এত দরদ দেখাতে হবে না। তার অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে নিজের জামা কাপড়গুলা পাল্‌টাও দেখি।"

তারণ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া, "এইবার পাল্‌টাব বড়বৌ, এইবার পাল্‌টাব। দিনকতক যাক্‌, তারপর সকলকে দেখাব, বাবুয়ানি কি রকমে কর্ত্তে হয়।"

বড় বৌ হাসি চাপিয়া বলিল, "কে বাবুয়ানি করবে, তুমি ? বাবুয়ানির কপাল !"

তারণ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখবে—দেখবে।"

পঁচিশ টাকা মাহিনার রেলভাড়া পাঁচ টাকা বাদে বাকী কুড়ি টাকায় সংসার চালাইয়া তারণ যে কিরূপে ছোট ভাই সারদার পড়ার খরচ যোগাইত, তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সাধারণের বিবেচনায় এই অসাধ্য কাজটাকে সুসাধ্য করিয়া জানিতে তারণকে কতটা কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বড় বৌ ছাড়া আর কেহ জানিত না। কেন না স্বামীর আফিসের জামা কাপড়ে তালি দেওয়া তাহার নিত্যকার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বাড়ী হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত জুতাটা পায়ের পরিবর্ত্তে হাতে যাইত বলিয়া মধ্যে মধ্যে তারণের পায়ে যে কাঁটা ফুটিত, প্রতি রবিবারে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিতে হইত। আফিসে জলখাবারের পাঠ ছিল না; সুতরাং সকাল সাতটার পর রাত্রি নয়টায় খাইতে বসিয়া তারণ যখন হাঁড়ীর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিত, এবং হাঁড়িতে অন্নের অভাব দেখিয়া বড়বৌয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আপনার ক্ষুধার অল্পতা জানাইয়া পাতে কতক ভাত রাখিয়া উঠিয়া পড়িত, তখন বড় বৌ চোখের জল রাখিতে পারিত না। হায়, এ কষ্ট কবে ঘুচিবে ? ভগবান্, মুখ তুলিয়া চাও।

মাহিনা পাঁচ টাকা বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সারদা এফ এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল। কলেজের বেতন এবং বইএর খরচ এত বাড়িল যে, তাহার নিকট বর্দ্ধিত বেতনের পাঁচটা টাকা কিছুই নয়। তাহার কষ্ট দেখিয়া লোকে পরামর্শ দিল, কলেজের পরিবর্ত্তে সারদাকে একটা আফিসে ঢুকাইয়া দিলে খুব ভাল হয়। তারণ কিন্তু লোকের এই সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। লোকে বলিল, বামুনটা মাথা পাগলা।

এত কষ্টের মধ্যেও তারণ রবিবারে যখন যজ্ঞেশ্বর দত্তের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডায় যোগ দিত, তখন তাহার 'ছ'তিন নয়' পোয়া বার'র জন্য উৎসাহপূর্ণ চীৎকার শুনিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না, এই লোকটাকে মাসের অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। তারণ প্রায়ই যজ্ঞেশ্বর দত্তকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "থাম না দত্তজা, আর তিনটে বছর। সেরো ছোঁড়া একবার পাশটা কত্তে পারলে রোজ সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছ'তিন নয় চালাব।"

সারদা আসিয়া দেশে বসিল, দত্তজা নূতন পাশার ছক আনাইল, তারণ কিন্তু রবিবার ব্যতীত আর কোন দিনই পাশার আড্ডায় যোগ দিল না। সে তালি দেওয়া জুতা, ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়ের ভিতর দিয়া কেরাণী-জীবনের দৈন্য প্রকাশ করিতে করিতে সপ্তাহের অবশিষ্ট ছয়টা দিন নিয়মিতরূপে ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে লাগিল। মাহিনা তখন আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়াছিল, সারদা শ্বশুরের প্রদত্ত দুই হাজার টাকায় ডাক্তারখানা খুলিয়া বেশ দু'পয়সা ঘরে আনিতেছিল, এবং সে পয়সার শেষ আধলাটী পর্য্যন্ত

দাদার হাতে তুলিয়া দিতেছিল। তথাপি কিন্তু তারণ ভট্টচাজ্যির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, এবং প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত "ছ'তিন নয়" চালাইবার জন্ম তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। কাজেই লোকে ভাবিল, লোকটা হাড় কৃপণ।

দাদার কার্য্যে সারদারও যে আপত্তি ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু তারণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিত, "ওরে ভাই, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর কি বাবুয়ানি সাজে? চাকরী ছেড়ে যখন ডাক্তার বাবুর দাদা হ'য়ে ঘরে বস্‌বো, তখন দেখবি, তারণ ভট্টচাজ্যি কি রকম বাবুগিরি কত্তে পারে।"

বড় বৌ বলিত, "দেখ, তুমি ও রকম চালে চল্‌লে, ঠাকুরপোর মাথা হেঁট হয়। হাজার হোক, ও হ'লো একজন বড় ডাক্তার।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমি যে তারণ ভট্টচাজ্যি, তা সকলেই জানে।"

কনিষ্ঠের সম্মান রক্ষার জন্ম বড়বৌয়ের নিতান্ত অনুরোধে সেই মাসকাবারে তারণ একখানা জামা এবং এক যোড়া জুতা কিনিয়া আনিল।

২

সে দিন খাইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরিয়া তারণ বাটীর বাহির হইতেই দেখিল, রসিক মোড়লের ছেলে গৌর ডাক্তারখানা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তারণ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে গৌর, কোথায় গিয়েছিলি?"

গৌর বলিল, "ডাক্তার বাবুর কাছে।"

"কার অসুখ।"

"বাবার।"

"কি অসুখ রে?"

"জ্বর, সর্দ্দি, বুকে বেদনা।"

একটু চিন্তিতভাবে তারণ বলিল, "তাইতো, সারু কি বল্‌লে?"

গৌর ম্লানমুখে বলিল, "বল্‌লেন, এখন ফুরসৎ নাই।"

"আচ্ছা, তুই দাঁড়া" বলিয়া তারণ দ্রুতপদে ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল এবং সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁরে সারু, রসিক মোড়লের অসুখ, একবার দেখতে যেতে পারবি না?"

সারদা গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখে হবে কি? ভিজিট তো দিতেই পারবে না, তার উপর ওষুধের দাম দেবারও ক্ষমতা নাই।"

তারণ বলিল, "ক্ষমতা নাই ব'লে লোকটা বেঘোরে মারা যাবে রে?"

সারদা বলিল, "তা আমি কি কর্‌বো। ওষুধ তো আমার ঘরের নয়।"

তারণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হোক্, তুই দেখে আর, ওষুধ দে। আহা, গরীব লোক!"

সারদা বিরক্তির সহিত বলিল, "অমন গরীব দেশে লক্ষ লক্ষ আছে। তা হ'লে তো ব্যবসা কত্তে হয় না।"

বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিল তারণ বলিয়া, "ব্যবসা কত্তে হবে ব'লে গরীবে এক ফোঁটা ওষুধ পাবে না? না না, তুই ওষুধ দে, রসিক এরপর খেটে দাম শোধ দেবে। তুই জানিস্ না সারু, পাঠশালে ক্ষিদে হ'লে রসিকের মায়ের কাছে যেতাম, বুড়ী কোঁচড় পুরে মুড়ী দিত। সে কি চমৎকার মুড়ী! তেমন মুড়ী আজকাল আর দেখতেই পাই না।"

মুড়ীর চমৎকারিত্ব স্মরণেই হউক বা বুড়ীর দয়ার কথা মনে করিয়াই হউক, তারণের স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দূরে গাড়ীর শব্দ শ্রুত হওয়ায় আর বলা হইল না। "যাঃ, আটটার গাড়ী বুঝি ধত্তে পারলাম না।" বলিয়াই তারণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর আফিস হইতে ফিরিবার পথে রসিক মোড়লের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তারণ ডাকিল, "রসিক কোথায় হে, কেমন আছ?"

বলিতে বলিতে তারণ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ঘরের দাবায় উঠিল। রসিক ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে স্ত্রীকে আসন আনিতে বলিল, তারণ বলিল, "আসন থাক্, পায়ে এক হাঁটু কাদা। কেমন আছ? সারু এসেছিল? ওষুধ দিয়েছে?"

রসিক কষ্টে বিছানার উপর বসিয়া বলিল, "দুপুর বেলা এয়েছিলেন। ওষুধ আন্‌তে ব'লে গেছেন, কিন্তু দামের—"

বাধা দিয়া তারণ একটু জোর-গলায় বলিল, "দামের জন্যে কি আটকাচ্চে? পাগল আর কি। ওষুধটা আনালেই তো হ'তো।"

রসিক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারণ পকেট হইতে চারিটা টাকা বাহির করিয়া তাহার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দাম নিয়ে ওষুধটা আন্‌তে পাঠিয়ে দাও। গৌর কোথায় গেল? দেরী ক'রো না। হাতে ছিল না, আফিসে দরোয়ানের কাছ হ'তে ধার করে নিয়ে এলাম।"

রসিক হাঁ করিয়া দাদাঠাকুরের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর সজল-কণ্ঠে বলিল, "আমার তরে টাকা ধার ক'রে আন্‌লে দাদাঠাকুর?"

তারণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাতে আর হ'য়েচে কি? একেই বলে পাগল। এ টাকা তো আমারই বাক্সে যাবে। শুধু হাত-ফেরতা বৈ তো না।"

কথা শেষ করিয়াই তারণ দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ঘরে আসিয়া তারণ বড়বৌকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "সেয়োটার একটুও চক্ষু-

লজ্জা নাই বড় বৌ, রসিক মোড়লের ব্যারাম, তা ব'লে, দাম না দিলে ওষুধ দিতে পারবো না।"

বড় বৌ বলিল, "ঠিক কথাই তো ব'লেছে। তোমার মত চক্ষুলজ্জা রাখতে হ'লে ব্যবসা চলে না।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "দেখছি, তুমি শুদ্ধ ব্যবসাদার হ'য়ে উঠেছ। ওগো, ব্যবসা কত্তে হ'লেই দয়া-ধর্ম্মগুলো পুড়িয়ে খেতে হয় না।"

ঈষৎ রাগত ভাবে বড় বৌ বলিল, "না, দানছত্র বসাতে হয়।"

তারণ বলিল, "এই দেখ এক পাগল! আমি কি দানছত্র বসাতেই বল্‌ছি। তবে গরীব দুঃখী, যাদের উপায় নাই, তাদের এক আধ ফোঁটা ওষুধ দিলে তেমন ক্ষতি হয় না। আর ওষুধই বা কত, এক শিশি ওষুধে দু'দশ ফোঁটা ওষুধ, বাকী জল।"

বড় বৌ বলিল, "কিন্তু সে দু'দশ ফোঁটা ওষুধেরই দাম কত জান?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তারণ বলিল, "জানি গো জানি, দু'দশ হাজার টাকা। বেশ, এক এক শিশি ওষুধ বেচে তোমরা কোঠা বালাখানা কর।"

বড় বৌও হাসিয়া বলিল, "আর তুমি চক্ষু-লজ্জা নিয়ে চিরকাল তালি-দেওয়া জুতো আর ছেঁড়া কাপড় জামা নিয়ে বেড়াও।"

তারণ হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেই ভাল, আমি পাগল মানুষ, শেষে কোন্ দিন তোমাদের কোটা বালাখানা ভেঙ্গেচুরে দেবো?"

(৩)

মাস দুই পরে তারণ যখন পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া ঘরে ফিরিল, তখন বড় বৌ সে সংবাদে কিছুমাত্র আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া বরং একটু বিষণ্ণ ভাবেই বলিল, "তা হলে দেখছি, যদিও দু'মাস ছ'মাস পরে চাকরী ছাড়তে, এখন আর তাও ছাড়বে না।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "এই দেখ, মাইনে বেড়েচে, কোথায় হরির লুট দেবে, তা নয় আক্ষেপ কর্ত্তে বস্‌লে। ভাল, আমার চাকরী বেচারীর উপর তোমাদের এত রাগ কেন বল দেখি?"

বড় বৌ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "রাগ হয় সাধে! বার মাস তিরিশ দিন শীত নাই, বর্ষাবাদল নাই, সকালে সাতটায় একমুঠো খেয়ে ছুট্ ছুট্। আচ্ছা, তোমার ব্যাজারও হয় না?"

ঘাড় নাড়িয়া তারণ বলিল, "ব্যাজার হোলে, দরজায় ডাক্তার এস্, সি, ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্ সাইনবোর্ডটা উঠতো কি রকমে বল তো?"

বড় বৌ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "সে কথা একশোবার স্বীকার করি। কিন্তু এখন

৪

ঠাকুর পো শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যখন দশ টাকা ঘরে আন্‌চে, তখন আর তোমার এ ছুটাছুটি কেন? বয়সও তো চল্লিশ পার হ'য়েচে, এখন পূজো আহ্নিক তপ জপ—"

বাধা দিয়া মৃদু মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সহাস্যে তারণ বলিল, "সে সব ঠিক ক'রে রেখেছি বড় বৌ, আর একটা বছর যেতে দাও। তার পর দেখবে,তারণ ভট্টচাজ্যি সকালে উঠে যে পূজোয় বসবে, এগারটার আগে আর উঠচে না। তার পর আহার একটা কি দেড়টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। দেড়টার পর থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত দত্তজার বৈঠকখানায়—"

একটা অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া বড় বৌ প্রস্থানোদ্যত হইল। তারণ ব্যস্তভাবে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও কি, চ'লে যাও যে, শোন শোন।"

বড় বৌ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার এই গাঁজাখুরি গল্প শুনলে তো চলবে না। আমার কাজ আছে।"

তারণ বলিল, "কাজ তো বার মাস তিরিশ দিনই আছে। ভাল, একদিন না হয় দু'দণ্ড বসলে।"

ঈষৎ হাসিয়া বড় বৌ বলিল, "বারমাস তিরিশ দিনের মধ্যে খাওয়াটা যদি দু'একদিন বন্ধ দেবার হ'তো, তা হ'লে না হয় দু'দণ্ড বস্‌তাম। কিন্তু তা যে হবার যো নাই। ঐ জিনিসটি রোজ চাই।"

সহাস্যে তারণ বলিল, "রোজ কেন, দিনে দু'বেলা। আর আজ বিশ বছর তো সেই দু'বেলা হেঁসেল ঠেলে আসচো। ভাল, দশটা দিন না হয় জিরেন নাও না।"

বড় বৌ বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলিল,"ও কথা, আমি জিরেন নেব? কর্‌বে কে?"

তারণ বলিল, "কেন, ছোট বৌমা তো আছেন। দিনকতক রান্নার ভার তাঁর হাতেই দাও না।"

বড় বৌ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল,"অবাক্ করলে তুমি। ছোট বৌ রাঁধবে? সে এক ঘটি জল গড়িয়ে খেতে পারে না, আর রেঁধে তোমাদের ভাত দেবে।"

হঠাৎ তারণের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লে, তিনি এক ঘটি জল গড়িয়ে খেতে পারেন না? কেন, তাঁর কি কোন অসুখ আছে?"

বড় বৌ আরও একটু জোরে হাসিয়া বলিল, "এই তেই লোকে তোমাকে পাগল বলে। অসুখ থাকতে যাবে কেন, বালাই। তবে পারে না, এই আর কি।"

উগ্রস্বরে তারণ বলিল, "কেন পারে না, তাই আমি শুনতে চাই। তুমি মেয়েমানুষ, তিনিও মেয়েমানুষ। তুমি যা পার, তিনি তা পারেন না কেন?"

স্বামীর ক্রোধের আবির্ভাব দেখিয়া বড় বৌ একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বার বার পশ্চাতে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল, "সব্বাই কি সব পারে। বিশেষ ছেলেমানুষ।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তারণ বলিল, "কিসের ছেলেমানুষ? আঠার উনিশ বছরের মেয়ে, ছেলে-মানুষ? তুমি তেরো বছরে এসে আমাকে আফিসের ভাত দিয়েছিলে, তা জান?"

বড় বৌ কি বলিতে গেল; কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়াই তারণ চীৎকার করিয়া বলিল, "সেটি হচ্চে না বড় বৌ, এই আমি ব'লে দিচ্চি, আমার সংসারে সকলকে সমান খাটতে হবে। তুমি কেরাণীর স্ত্রী, আর তাঁর স্বামী বড় ডাক্তার, এ তফাৎটুকু যেন আর না দেখতে পাই।"

রাগে পান না লইয়াই তারণ বাহির হইয়া গেল। বড় বৌ শঙ্কিতচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই সারদা উঠান হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে বৌঠান, দাদা এত চীৎকার কচ্ছিলেন কেন?"

ব্যস্তভাবে বড় বৌ বলিল, "ওর কথা ছেড়ে দাও, কখন্ কি মেজাজে থাকে, তা তো বলা যায় না। একটুতেই আগুন, আবার একটুতেই জল।"

সারদা জুতার আগাটা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "কি বলছিলেন না, কেরাণীর স্ত্রী—ডাক্তারের স্ত্রী?"

বড় বৌ হাসিয়া বলিল, "কে জানে কত কথাই ব'কে গেল, আমার কি সব কথায় কান দেবার সময় আছে? যাই, উনুনটা ধরিয়ে দিই।"

বলিয়া বড় বৌ তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় ঢুকিয়া পড়িল। সারদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই বড় বৌ দেখিল, রন্ধনশালা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। সে কতকটা শঙ্কিত এবং কতকটা বিস্মিত ভাবে তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দরজায় গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। দেখিল, ছোট বৌ উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছে। দেখিয়া সে কতক্ষণ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর ছোট বৌকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ও মা, তুই এরি মধ্যে উঠে রান্না চাপিয়েছিস্ ছোট বৌ?"

ছোট বৌ শিল পাতিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া মশলা পিষিতেছিল; সে মুখ না ফিরাইয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "কাজেই; এতটা বেলা হ'য়ে গেল—"

বাধা দিয়া বড় বৌ বলিল, "হ'লেই বা বেলা। আজ রবিবার, আপিসের ভাতের তো তাড়া নাই।"

ছোট বৌ মৃদু অথচ পরুষকণ্ঠে বলিল, "আপিসের তাড়া নাই ব'লে কি কাউকে খেতে হবে না?"

বড় বৌ দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল, "তাই বুঝি তুই তাড়াতাড়ি রাঁধতে গিয়েছিস্? আচ্ছা, আজ তুই রেঁধে খাওয়া দেখি, কেমন রাঁধুনি।

বলিয়া বড় বৌ হাসিয়া উঠিল। ছোট বৌ কিন্তু হাসিল না; সে স্বরটা একটু চড়াইয়া বলিল, "এর আবার দেখাদেখি কি? যে যেমন পারবে রাঁধবে। দু'জনের ঘর যখন, তখন পারি না পারি, আমাকে কত্তেই হবে।"

বড় বৌয়ের মুখের হাসি সহসা নিবিয়া গেল; সে ম্লানদৃষ্টিতে ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ তো, মেয়েমানুষের এই তো কাজ। আর আমার গতরই কি চিরদিন বইবে? তবে আগে সব দেখে শুনে নে, নয় তো সদ্য সদ্য পাকা রাঁধুনী হ'তে গেলে পারবি কেন?"

বড় বৌ চেষ্টা করিয়া আর একটু হাসিল। ছোট বৌ যেন ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমি অত পাকা কাঁচা জানি না। উনি বল্লেন, শঙ্করপুরে ডাক আছে, এক মুঠো খেয়ে যাবেন। এ দিকে তোমারও ঘুম ভাঙ্গেনি, কাজেই—"

বড় বৌয়ের মুখখানা যেন কালি হইয়া গেল। ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "ঠাকুরপো সে কথা কই আমাকে কিছু বলেনি তো?"

ছোট বৌ উত্তর না দিয়া দ্রুতহস্তে মশলা পিষিতে আরম্ভ করিল। বড় বৌ একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে মুখ-হাত ধুইতে গেল। মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া সে স্নানে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ শেষ করিতে লাগিল। ছোট বৌ রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেও কিরূপে যে তাহার উপসংহার করিবে, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং সে খুব ব্যস্ত ভাবেই কাজ শেষ করিয়া স্নানে চলিল। তাহার বুকের যে একটা রুদ্ধ অভিমান ফুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, এই ব্যস্ততার মধ্যে সেটাকে যেন সে সম্পূর্ণ চাপা দিয়া ফেলিল।

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া বড় বৌ বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, উপসংহারটা বাস্তবিকই খুব করুণরসাত্মক হইয়াছে। ভাতের হাঁড়ির ফেনসমেত ভাতগুলা কতক ছোট বৌয়ের পায়ের উপর পড়িয়াছে, কতক উনানের ভিতর গিয়াছে, কতক উনানের আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাঁড়িটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আর ছোট বৌয়ের চীৎকারে পাড়ার যত মেয়ে উঠানে আসিয়া জড় হইয়াছে। বড় বৌ তাড়াতাড়ি কলসীটা নামাইয়া ভিজা কাপড়েই ছুটিয়া গেল এবং জ্বালা নিবারণের জন্য প্রতিবেশিনীদিগের কথিত বিভিন্ন প্রকার ঔষধের মধ্যে কোন্‌টা দিবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

তাহাকে বেশী ভাবিতে হইল না; সংবাদ পাইয়া সারদা অবিলম্বে আসিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিল, জ্বালা কতকটা কমিল। তখন প্রতিবেশিনীরা এই কচি মেয়েটাকে গুরুতর রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য আক্ষেপ প্রকাশের সহিত ইঙ্গিতে বড় বৌয়ের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। বড় বৌ বলিতে গেল, "ওগো, ও আবাগী নিজে

ইচ্ছা ক'রেই রাঁধতে এসেছে।" কিন্তু হিতৈষিণীদিগের সহানুভূতির স্রোতে তাঁহার প্রতিবাদ কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহারা প্রস্থানকালে সারদাকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিয়া গেল, যদি ভাগের কাজই করিতে হয়, তবে সারদার উচিত একটা রাঁধুনী রাখা। তাহার অর্থের অভাব কি? আর রাঁধিতে গিয়া স্ত্রী যদি পুড়িয়া মরিল, তবে তাহার অর্থেই বা কি হইবে?

তারণ স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ছোট বৌমাকে রাঁধতে ব'লেছিলে?"

বড় বৌ বলিল, "আমি কোন কথাই বলি নাই।"

"তবে উনি রাঁধতে গেলেন কেন?"

"তা কেমন ক'রে জানবো। তবে ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার কালকার কথাগুলো শুনেছিল, সেই বোধ হয় ব'লে থাকবে। তোমার তো রাগলে জ্ঞান থাকে না।"

"কিন্তু আমি কি মন্দ কথা বলেছিলাম বড় বৌ?"

বড় বৌ বলিল, "লোকে অনেক সময় ভাল কথাতেও আঁচে মন্দ ধ'রে নেয়।"

তারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আয় যথেষ্ট বাড়িলেও বাজার-হাটের ব্যবস্থা ঠিক পূর্ব্বের হিসাবেই চলিতেছিল। সেটা সারদা বা ছোট বৌ উভয়েরই মনোনীত না হইলেও আগে এ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না, কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। স্নানের ঘাটে, বোসেদের বাড়ীতে, দাসেদের খিড়কী ঘাটে ইহা লইয়া যে সকল জল্পনা চলিত, তাহার অনেক কথাই বড় বৌয়ের কানে আসিত, এবং তারণ ভট্টাচাজ্যি যে ভায়ের উপায়ের টাকাগুলা হস্তগত করিয়া তাহা আপনার স্ত্রীর পরিণামের উপায়ের জন্য রাখিয়া দিতেছে, আর ভাই ভাদ্রবধূকে আধপেটা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতেছে, এমন সব কথাও শোনা যাইত। বড় বৌ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিত, ঘরের হাঁড়ির খবর কিরূপে বাহিরে যায়।

কিন্তু ছোট বৌ যখন ইদানীং প্রায় তরকারীর জন্য আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, এবং সারদাও এক এক দিন তরকারীগুলাকে ছাই-পাঁশ নামে অভিহিত করিয়া অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া যাইত, তখন ঘরের খবর কোথা হইতে বাহিরে যায়, তাহা বুঝিতে বড় বৌয়ের বিলম্ব হইল না। বুঝিলেও সে স্বামীকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিল না; শুধু বাজার-হাট সম্বন্ধে একটু মুক্তহস্ততা দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তারণ কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে কর্ণপাত করিল না; শেষে একদিন বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, "গরীব গেরস্ত ঘরে এর চেয়ে ভাল খায় না। যার ভাল খেতে ইচ্ছা হবে, সে নিজের পয়সা ভেঙ্গে খাবে। আমার এর বেশী যোগাবার শক্তি নাই।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "তুমি যদি লোকের রোজগারের সব পয়সা হাত কর, তবে সে নিজের পয়সায় খায় কি ক'রে?"

উগ্রস্বরে তারণ বলিল, "কি ক'রে, তার আমি কি জানি? আমি কারো কাছে ভিক্ষা নিতে যাই? না খেয়ে না দেয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তার পয়সা আমি একশো বার নেব।"

(৫)

যজ্ঞেশ্বর দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে ভট্‌চাজ, চাকরী ছাড়চো কবে?"

তারণ বলিল, "আর দু'টো মাস দত্তজা।"

দত্তজা বলিল, "তোমার এ দু'টো মাস বোধ হয় বার মাসের ভিতর নাই?"

তারণ নীরবে মৃদু হাসিল। দত্তজা বলিল, "তোমার কৃপণ স্বভাবটা একটু ছাড় ভট্‌চাজ।"

তারণ হাসিয়া বলিল, "স্বভাব যায় ম'লে।"

দত্তজা বলিল, "কিন্তু গাঁয়ে তোমার নিন্দায় যে কান পাতা যায় না।"

তারণ বলিল, "সেটা নিন্দুকদেরই দোষ।"

দত্তজা গম্ভীর ভাবে বলিল, "দোষ কি তোমারও নাই? যে ভাই এত টাকা রোজগার কচ্চে, সেই ভাইকে ভাইয়ের স্ত্রীকে খেতে দেবে না, এটা কি ভাল কাজ হোচ্ছে?"

তারণ বিস্মিত ভাবে দত্তজার মুখের দিকে চাহিল। দত্তজা বলিল, "তা ছাড়া ছোট বৌটাকে খাটিয়ে মেরে ফেল্‌চো।"

তারণ বলিল, "মেয়েমানুষ খাটবে না তো ব'সে থাকবে?"

দত্তজা বলিল, "যার স্বামী মাসে দু'শো টাকা রোজগার করে, সে খাটতে যাবে কেন?"

এ কথার উত্তর তারণ দিতে পারিল না। দত্তজা বলিল, "সাবধান ভট্‌চাজ, কাল বড় খারাপ। ঘর না ভাঙ্গে।"

বিস্ময়ের সহিত তারণ বলিল, "ঘর ভাঙ্গবে?"

দত্তজা বলিল, "শুনছি ত সেই রকম। ভাই হ'লেও তোমার পেট ভরাবার জন্য তো সে লেখাপড়া শেখেনি, আর রোজগারও কচ্চে না।"

তারণ শুনিয়া এমনই জোরে হাসিয়া উঠিল যে, তাহাতে দত্তজা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

তারণ এটাকে খুব মজার সংবাদ মনে করিয়া বড় বৌকে শুনাইবার জন্য উৎসুক ভাবে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ীর ভিতর পা দিবামাত্র তাহার এই কৌতুকজনক সংবাদটা যেন একটা ভীষণ দুঃসংবাদে পরিণত হইল। বাড়ীতে ঢুকিতেই শুনিতে পাইল, ছোট বৌ গলা ফুকারিয়া বলিতেছে, "কেন বল তো আমি তোমার কথা শুনবো? আমার সোয়ামীর রোজগারের পয়সা খাচ্চ, আমাকে বল্‌তে লজ্জা করে না। আমি মনে করলে

তোমার মত দশটা মাগীকে দাসী-বাঁদী ক'রে রাখতে পারি, তা জান। আসুক আজ, হাঁড়ী আলাদা না করলে যদি আমি জলগ্রহণ করি, তবে আমি বামুনের মেয়েই নই।"

হায়, যে অভাগিনী আজ বিশ বৎসর দাসীর অধম হইয়া এই সংসারে খাটিয়া আসিতেছে, নিজে না খাইয়া সকলকে খাওয়াইয়াছে, তাহার কৃতকর্ম্মের এই পুরস্কার! ক্রোধে ক্ষোভে তারণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করিতে লাগিল। সে অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "তাই কর ছোট বৌমা, তুমি যদি পৃথক্ না হ'য়ে জলগ্রহণ কর, তবে তোমার বাপের মুখে—।"

বড় বৌ ছুটিয়া সম্মুখে আসিল; তিরস্কারের স্বরে বলিল, "মেয়েতে মেয়েতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তুমি তার মাঝে কথা কইতে এলে কেন? ছি ছি, কি করলে?"

গম্ভীর স্বরে তারণ বলিল, "স্ত্রীর উপর স্বামীর যেটুকু কর্ত্তব্য, তার বেশী একটুও করি নাই।"

সারদা বাড়ী আসিলে ছোট বৌ তাহাকে সকল কথা জানাইল। শুনিয়া সারদা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একেই সে ভ্রাতার স্বার্থপরতায় যার পর নাই বিরক্ত হইয়াছিল, তাহার উপর স্ত্রীর প্রতি এই অভদ্র ব্যবহারে সে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোকের নিকট ভ্রাতার আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করিল এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে, অথবা ভায়ের সঙ্গে পৃথক্ হইবে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়স্কর, তাহার পরামর্শ চাহিল। পাঁচজনে পৃথক্ হইবার পরামর্শই দিল।

(৬)

পরদিন পাঁচজন মধ্যস্থ আসিয়া ভাগ-বাঁটরা করিয়া দিল। ভাগ করিবারও বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু বাড়ীখানা, আর তৈজসপত্র। ডাক্তারখানা সারদার শ্বশুরের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত, সুতরাং তাহার ভাগ হইল না।

এ দিকের ভাগ শেষ হইলে ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী তারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এবার নগদ টাকার বিভাগ। নগদ কত আছে?"

তারণ হিসাব করিয়া বলিল, "তিন টাকা সাড়ে তের আনা।"

সকলেই বিস্ময়ে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী সারদার মুখের দিকে চাহিলেন। দাদার স্বার্থপর ব্যবহারে সারদা রাগিয়া উঠিয়াছিল; চক্রবর্ত্তীর ইঙ্গিতে সে বলিল, "তা হ'লে এই চার বছরের হিসাবটা ওঁকে দেখাতে বলুন।"

ক্রুদ্ধভাবে তারণ বলিল, "নিজে রোজগার করেছি, নিজে খরচ করেছি, তার হিসাব নিকাশ আমি দিতে পারবো না।"

এই উত্তরে সারদা আরও রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। দত্তজা তখন মাঝে পড়িয়া তারণকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হিসাবটা তোমার দেওয়া দরকার ভট্‌চাজ।

শুধু তোমার নিজের রোজগার হ'লে কোন কথা ছিল না, কিন্তু সারদার রোজগারও তো আছে।"

সপ্রতিভ ভাবে তারণ বলিল, "সারদার রোজগার! তার আবার হিসাব নিকাশ কি? ও কত টাকা আমাকে দিয়েছে?"

সারদা নোটবুক বাহির করিয়া চারি বৎসরে কোন্ মাসে কত দিয়াছে, তাহা পড়িয়া সকলকে শুনাইল। মোট হিসাব করিয়া হইল, চারি হাজার সাত শত তেত্রিশ টাকা। দত্তজা তারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি বল তুমি?"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া তারণ উঠিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা আনিয়া সারদার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই দেখে নে, ব্যাঙ্কে তোর নামে ঠিক ঐ টাকাটা জমা আছে কি না?"

চক্রবর্ত্তী খাতা দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক তাই আছে বটে। তা হ'লে ধর, এই টাকাটার অর্দ্ধেক—"

বাধা দিয়া তারণ উগ্রস্বরে বলিল, "ও টাকার আবার ভাগ কি? আমি সেরোর দাদা, আমি ওর রোজগারের টাকার ভাগ নিতে যাব?"

সকলেই হাঁ করিয়া তারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারদা মাথা নীচু করিল।

মধ্যস্থগণের বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তারণ দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, এবং বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে বড় বৌ, তোমরা সকলে আমায় চাকরী ছাড়তে ব'লেছিলে; কিন্তু ভাগ্যে তোমাদের কথায় চাকরী ছাড়ি নাই? কেমন নাকের উপর টাকাগুলো ফেলে দিয়ে এলাম!"

বিস্ময়ের সহিত বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা?"

জোরে মাথা নাড়িয়া তারণ বলিল, "কত কি, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। আবার মজার কথা শোন, আমায় এই টাকার ভাগ নিতে বলে। আমি তারণ ভট্‌চাজ্যি, সেরোর দাদা, আমি তার টাকার ভাগ নিতে যাব? গলায় দড়ি! আমাকেই আবার তোমরা বল পাগল। আচ্ছা সব পাগল যা হোক্।"

বলিয়া তারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বড় বৌ শ্রদ্ধাপূর্ণ সজল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরের লোকে কিন্তু বলিতে লাগিল, "পাগলের কাণ্ডই আলাদা। তারণ ভট্‌চাজ্যি আস্ত পাগল।"

তারণ ভট্‌চাজ্যি কিন্তু এ কথায় একটুও দুঃখ বা ক্রোধ অনুভব করিল না। তবে সময়ে সময়ে সে বড় বৌয়ের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিত, "তাই তো বড় বৌ, দত্তজা মিছে পাশার ছকটা কিন্‌লে। আর আমারও এ জন্মে জপ আহ্নিকটা আর করা হ'লো না!"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রঘুবংশে প্রেম—বিরহ

আগেই বলিয়াছি যে, মহাকাব্যে প্রেমের তিন মূর্ত্তি; পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। তা'র মধ্যে রঘুবংশে পূর্ব্বরাগ ও মিলনের কথা বলিয়াছি। প্রেমের যে অন্য অসংখ্য মূর্ত্তি আছে, —মান, কলহ, খণ্ডিত, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি, ইত্যাদি—মহাকাব্যে তাহাদের স্থান নাই; বিশেষতঃ রঘুবংশের মত মহাকাব্যে তাহাদের স্থান হইতেই পারে না। কারণ, সেগুলি পাতলা জিনিস; মহাকাব্যে পাতলা জিনিস জমে না। মহাকাব্যে পূর্ব্বরাগও বড় জমে না, কারণ, সেটাও একটু পাতলা-পাতলা। মিলন ও বিরহ বেশ গম্ভীর; বেশ গম্ভীর, তাই জমে। কালিদাস রামসীতার মিলন কেমন জমাইয়াছেন, তা আগেই দেখাইয়াছি। দিলীপ-সুদক্ষিণার আর অজ-ইন্দুমতীর মিলনে যত কিছু ভাল জিনিস ছিল, তা'র উপর আরও রঙ্ ফলাইয়া কবি ত্রয়োদশে রাম-সীতার মিলন দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে মিলন শুদ্ধ মিলনের সুখ দেখাইবার জন্য—মিলনের আনন্দ দেখাইবার জন্য—মিলনের উল্লাস দেখাইবার জন্য নহে; তাহার ভিতরে আর একটি গভীর কথা আছে। সে গভীর কথাটি রাম-সীতার দেবত্ব। তাঁহারা যে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কত উঁচু, সেইটি দেখানই কবির উদ্দেশ্য।

যে মিলনের আনন্দ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহার আনন্দে সকল জীবজন্তু, এমন কি, বৃক্ষলতাও আনন্দিত, সে মিলন কি মিলনেই শেষ হইয়া যাইবে? তাহা হইলে কি হইল? তাই কবি এ অপূর্ব্ব মিলন অপূর্ব্ব বিরহে শেষ করিয়াছেন।

আমরা সেই অপূর্ব্ব বিরহের কিছু আভাস দিব। রঘুবংশে কালিদাস দুইবার পুরুষের বিরহ দেখাইয়াছেন—একবার ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের, আর একবার সীতার বনবাসে রামের। আগে রতি-বিলাপের সঙ্গে অজ-বিলাপের তুলনা করিয়া, অজ-বিলাপ যে কত মনোহর দেখাইয়াছি। সে কথা আর তুলিব না। কিন্তু অজ-বিলাপের সঙ্গে রাম-বিলাপ তুলনা করিতে হইবে।

অজ-বিলাপ ১৭টি কবিতায়, সুতরাং খুব সংক্ষেপ। কবির কিন্তু এতটা সংক্ষেপও বেশী বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি রামের বিলাপ এক কবিতায় সারিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বনবাসে দিয়া আসিয়া রামকে সেই খবর দিলেন, তখন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্প-
তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।

কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥"

"শুনিবামাত্রই রামের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। চারিদিকে হিম পড়িতেছে, মাঝখানে পৌষমাসের চাঁদ যেমন দেখায়, রামের তেমনি দেখাইতে লাগিল। তিনি লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে শুধু বাড়ী হইতেই বিদায় করিয়াছিলেন, মন হইতে ত তাঁহাকে বিদায় দেন নাই।"

বলিতে কি, রামের বিরহ-বর্ণনে একটি পূরা কবিতাও লিখেন নাই, আধখানাতেই শেষ করিয়াছেন—শেষ আধখানা ত বিরহের বর্ণনা নয়, কবির নিজের কথা। এই ত বীরের বিরহ! এই ত মহাকাব্যের বিরহ! যিনি মহাকাব্যের নায়ক, বিশেষ যিনি রঘুবংশের মত বড় মহাকাব্যের নায়ক, তাঁহার বিরহ ইহা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নয়। কবি সেটি বেশ বুঝিয়াছিলেন, পরের কবিতাটিতে একটু টিপ্পনীও করিয়াছেন :—

"নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্
বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং
রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস ॥"

"তিনি মনের শোক মনেই মিটাইলেন; বর্ণাশ্রম-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক রহিলেন; তাঁহার মনে রজোগুণের লেশমাত্র রহিল না; এত বড় রাজ্য ভাইদের সঙ্গে একত্রে ভোগ করিতে লাগিলেন।"

অজ-রাজা শোকে অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বশিষ্ঠদেব আপনার প্রধান ছাত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও শাস্ত্রের সার কথাগুলি বুঝাইয়া দিয়া রাজাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অজ-রাজার মন কিন্তু প্রবোধ মানে নাই। অশ্বত্থের শিকড় যেমন বড় বড় অট্টালিকার ভিতর চলিয়া গিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, শোকও তেমনি রাজার মনের ভিতর শিকড় গাড়িল ও আট বৎসরের মধ্যেই তাঁহার জীবন শেষ করিয়া দিল। এই আট বৎসর যে তিনি বাঁচিয়াছিলেন, সে শুধু কর্ত্তব্য বলিয়া, ছেলেটি নাবালক বলিয়া। রামকে কেহই প্রবোধ দিল না, তিনি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিলেন, 'স্বয়মেব' শোক সংবরণ করিলেন, এবং সাবধান হইয়া রাজধর্ম্মপালনে মন দিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার আর আসক্তি রহিল না। তিনি নির্লিপ্ত-নির্বিকারচিত্তে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অজ-রাজার শোক গাঢ় ও গভীর, রামের শোক গাঢ়তর, গভীরতর, কিন্তু তাহাতে একেবারে উচ্ছ্বাস নাই। ইহাতেই রামের মহত্ত্ব, ইহাতেই রামের দেবত্ব।

রাম ও সীতা দু'জনের মিলন কবি ত্রয়োদশে বর্ণনা করিয়াছেন, চতুর্দ্দশে দু'জনের বিচ্ছেদ হইল। বিচ্ছেদের পর একজনের অবস্থা দেখাইলাম, কিন্তু সীতার কি হইল? এ ত ইন্দুমতীর মত মৃত্যুর জন্য বিচ্ছেদ নহে, এ যে লোকনিন্দার জন্য বিচ্ছেদ। সে লোকনিন্দায় লজ্জা কাহার? সীতার। সুতরাং সীতার বিচ্ছেদ শুধু বিচ্ছেদ নয়, এ যে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা। লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের কাছে সীতাকে লইয়া গিয়া, রাজার আদেশ শুনাইয়া দিলেন, বলিলেন, "রাজা তোমায় চিরকালের জন্য বনবাস দিয়াছেন," তখন সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া মায়ের—পৃথিবীর কোলে পড়িলেন। পৃথিবীও যেন লোকলজ্জাভয়ে তাঁহাকে কোলে স্থান দিলেন না। লক্ষ্মণের যত্নে আবার তাঁহার চৈতন্য হইল। রাজা নিরপরাধে তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন জানিয়াও তিনি তাঁহার কোন দোষ দেখিলেন না, কেবল আপনার অদৃষ্টের দোষ দিলেন।

লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমের পথ দেখাইয়া দিয়া প্রণাম করিলেন ও প্রণামের পর বিদায় চাহিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধ এইখানেই শেষ। তিনি বলিলেন,—

"আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। তুমি ত আমার দাদার আজ্ঞাকারী মাত্র। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তুমি তাই করিয়াছ। ইহাতে তোমার দোষ কি? তুমি শ্বাশুড়ীদের আমার প্রণাম জানাইও, এবং প্রত্যেককে বলিবে, তাঁহারা যেন স্বতঃ-পরতঃ আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, তাহার মঙ্গলকামনা করেন। রাজাকে বলিও, আমি ত তাঁহার সম্মুখেই অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছিলাম, তবুও তিনি যে লোকনিন্দার ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিলেন, এটি কি তাঁহার বংশের মত কার্য্য হইয়াছে, না বিদ্যার মত কার্য্য হইয়াছে?"

"অথবা তুমিও ত কাহারও মন্দ চাহ না। তবে যে তুমি আমার প্রতি এই ব্যব-হার করিলে, ইহা আমারই পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফল। পূর্ব্বে রাজ্যলক্ষ্মী উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, তাই বুঝি এখন লক্ষ্মী, আমি যে তোমার ঘরে থাকি, সেটা সহ্য করিতে পারিলেন না। যখন বনে থাকিতাম, রাক্ষসেরা তপস্বীদের উপর অত্যাচার করিলে, তপস্বিনীরা আসিয়া আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিত। সে ত তোমারই অনুগ্রহ। বল দেখি, এখন তুমি বর্ত্তমান থাকিতেও আমি কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব? তুমি ত আমায় একেবারে ত্যাগ করিয়াছ। আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমি এ পোড়া জীবন উপেক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে যে বিষম বিঘ্ন। তোমার তেজ যে আমার গর্ভস্থ রহিয়াছে, তাহাকে ত আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমার ছেলে হ'লে পর, আমি

সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তপ করিব, যেন জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার স্বামী হও, কিন্তু এমন বিচ্ছেদ যেন আর না হয়। বর্ণাশ্রমপালনই রাজার ধর্ম্ম। আমাকে যদিও বনে দিয়াছ, যদিও আমাকে তপস্বিনী করিয়াছ, তবুও অন্য তপাস্বনীদের যেমন দেখ, আমাকেও তেমনি দেখিও।"

সীতার বিলাপ সবে আটটি কবিতায়, অজ-বিলাপের অর্দ্ধেক মাত্র, কিন্তু এই আটটি কবিতায় যাহা আছে, তাহার তুলনা নাই। এই আটটি কবিতায় সীতার অগাধ পতিভক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কাহাকেও ভুলিয়া যান নাই। তিনি লক্ষ্মণকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, খাশুড়ীদের কাছে ছেলের জন্য প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছেন। একটি কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, যাহাতে রামের উপর একটু কটাক্ষ ছিল—"আমাকে ত্যাগ করা কি তোমার বংশের মত হইয়াছে, না তোমার বিদ্যার মত কার্য্য হইয়াছে? বলিয়াই অমনি তিনি সামলাইয়া লইলেন—'তুমি ত কখন কাহারও মন্দ ভাব না, মন্দ কর না। তুমি যে ইচ্ছা করিয়া আমার মন্দ করিলে, ইহা আমি মনেও স্থান দিতে পারি না। সকলই আমার অদৃষ্ট!' তিনি তপস্যা করিয়া দিন কাটাইয়া দিবেন, সে তপস্যার উদ্দেশ্য পুনর্জ্জন্মে রামের সহিত মিলন, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই।

তাঁহার বড় আনন্দ যে, রাম তাঁহাকে বনবাসে দিয়াও ভুলিতে পারিবেন না। কেন না, অন্য তপস্বিনীদের মত তাঁহাকেও ত রাজা দেখিবেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সালোমে

৪

রাজসভায় নৃত্য প্রাচ্যদেশে নূতন কথা নহে। আমাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত দেবরাজের অপ্সরাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মর্ত্তাভূমে এই কলিকালের তয়ফাওয়ালী পর্য্যন্ত অনেক শ্রেণীর নর্ত্তকীরই রাজসভায় মজুরার কথা শুনা যায়—কিন্তু প্রকাশ্য সভায় রাজকুলজার নৃত্য—ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। যাহা হউক, সালোমে পিতৃব্য কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও নাচিতে স্বীকৃতা হইল না। হেরোদ অনুরোধ ছাড়িয়া আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যা তাহাও অমান্য করিল। হেরোদিয়া ত গোড়া হইতেই নিষেধ করিয়া আসিতেছেন—কন্যা কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে হেরোদের এই অপমান দেখি তি বড়ই খুসী হইয়া বলিলেন, "কেমন, হইল তো, হুকুম শুনিল?" এবার নির্লজ্জ হেরোদকে লজ্জার চড় গাল পাতিয়া লইতে হইল। দ্রেত্রার্ক মুখে বলিলেন, "না নাচিল তো কি হইবে—তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আজ আমার বড়ই আনন্দ—এমন স্ফূর্ত্তিবোধ কোন দিন হয় নাই।" কিন্তু শুধু মুখে বলিলে কি হয়—আনন্দ নিরানন্দ লোকে যে চেহারা দেখিয়াই ধরিয়া ফেলে। সামান্য সৈনিকেরাও দ্রেত্রার্কের আঁধার মুখ দেখিয়া কাণাকাণি করিতেছিল। যখন কেহ অপরের নিকট নিজেকে সুখী বলিয়া প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিবিধ সুখের হিসাব দিতে আরম্ভ করে, তখন সে ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাধারণের সমক্ষে লজ্জা লুকাইবার জন্য হেরোদ মনকে চোখ ঠারিয়া, নিজের গৌরব-শঙ্খে ফুৎকার দিতে আরম্ভ করিলেন। "কেন তাঁহার আনন্দ হইবে না? আজ তাঁহাকে পায় কে? যে সীজার সসাগরা ধরণীর অধিপতি, তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন, আদর করিয়া বহুমূল্য 'সওগাৎ' পাঠাইয়া দিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে—সেই সঙ্গে তাঁহার পরম শত্রু কাপাডোবিয়ার রাজাকেও তলব দিয়াছেন—এই দুর্বৃত্তই কি না তাঁহার দূতগণকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সীজার 'মালিক', যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—এবার হয় তো তাঁহার শত্রুকে "ক্রুশ"-কাষ্ঠে লট্‌কাইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ করিবেন। দেখ দেখি বাপু—মানুষ এতে কি খুসী না হইয়া পারে—আজ জগতের কোন কিছুই এ সুখানুভূতির ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না—সালোমের অবাধ্যতা তো সামান্য কথা।"

মানুষের পাপ ও অহঙ্কার যখন শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, যখন সে সৌভাগ্যগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখনই ভগবানের শাস্তি তাহার শিরে অশনি-নিপাতের ন্যায় অতর্কিতে পতিত হইয়া থাকে। ইওকানানের ভবিষ্যদ্বাণী তাই উপযুক্ত সময়ে এই

বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। ইওকানান বলিতেছিলেন, "জগবদ্বিদ্বেষে সুবর্ণ-ঘট পরিপূর্ণ করিয়া, রক্তধূমল রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া পাপিষ্ঠ রাজা যখন সিংহাসনে বসিয়া থাকিবে—দেবদূত তখনই তাহাকে আঘাত করিবেন—তাহার সে প্রাণহীন দেহ কীটকৃমিতে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।" হেরোদিয়া বলিল, "কি সব অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে, শুনিতেছ তো? বলিতেছে, তোমার দেহ কৃমিকীটে ভক্ষণ করিবে।" হেরোদ বাপ্টিষ্টের কথা গায়ে মাখিতে চাহিলেন না; বলিলেন, " ও আমার কথা বলিবে কেন? সাধু আমার বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলে না; ও বলিতেছে, আমার শত্রু কাপাডোবিয়ার রাজার কথা—তাহাকেই কীটে খাইয়া ফেলিবে; ভ্রাতৃপত্নী গ্রহণ করিয়াই যা এক অপরাধ করিয়াছি, এ ছাড়া ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নামে আর কখনও কিছু বলে নাই—তা কথাটাও তো নিতান্ত অন্যায্য নহে—ফলেও বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটিয়াছে—অগম্যার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহার কুফল তো হাতে হাতেই ভোগ করিতে হইবে।"

অনুরাগ বিরাগে পরিণত হইলে পরিণয়-বন্ধন ছিন্ন করার জন্য শাস্ত্রের দোহাই মানা ইতিহাসেও বিরল নহে। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর ভ্রাতার সহিত রাণী ক্যাথেরিণের বাগ্‌দান মাত্র হইয়াছিল—প্রকৃত বিবাহ হয় নাই; কিন্তু অন্যে অনুরক্ত হইয়া অষ্টম হেনরী যখন ক্যাথেরিণকে পরিত্যাগ করার বাসনা করিলেন, তখন তিনি রোমান ক্যাথলিক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজ বিবাহের অবৈধতা ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। হেরোদের অবশ্য অতদূর সাহস হয় নাই বটে, কিন্তু হেরোদিয়া এই দ্বিতীয়বার বন্ধ্যাত্ব-দোষারোপ মাথা পাতিয়া লইলেন না—পূর্ব্বেরই ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উচিত কথা শুনাইয়া দিলেন। হেরোদ কিন্তু নিজের অত্যধিক আনন্দের অজুহাতে আর এ প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। হেরো-দিয়া পুনরায় তাঁহাকে সে স্থান হইতে উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, "খুসী হওয়া তো তোমার স্বভাব নয়—তবে হইয়া থাক ভালই, কিন্তু কা'ল সকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে আবার শীকারে বাহির হইতে হইবে, সীজারের দূতগণের তো যথাসম্ভব খাতির করা চাই।" চতুরা নারী মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞা; কিন্তু দেব কুসুমায়ুধ নিজের অন্ধ সেবককে সকল সময়ে সীজারএর jurisdiction মানিতে দিবেন কেন? হেরোদিয়ার পাকা চাল কাঁচিয়া গেল। হেরোদ অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; পরন্তু সালোমেকে যথা-সাধ্য কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, "আজ সন্ধ্যায় আমার মন বড়ই বিষণ্ণ—আসিবার সময় নররক্তে পা পিছ্‌লাইয়া গিয়াছে, সেটা মোটেই সুলক্ষণ নহে। তাহার উপর—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি মাথার উপর—অন্তরীক্ষে—যেন কোন বিরাট্ বিহগের পাখার ঝাপ্‌টার শব্দ শুনিয়াছি।" জুডিয়া রোমের অধীন, রোমক প্রভাবে প্রভাবান্বিত; রোমের ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক Augurগণ বলাকার গতি প্রভৃতি দেখিয়া ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিত; সুতরাং রোমকভাবাপন্ন সামন্তরাজ এ পাখার

ঝাপটার অর্থ কি বুঝিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিংবা হয় তো আসন্ন দেবদূতের পাখার শব্দ মনে করিয়াই হেরোদের প্রাণে ভয় হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক, হেরোদের মন আজ ভাল নাই, তাই সালোমে-সন্নিধানে বারংবার এই প্রার্থনা। সালোমে নাচিলে পুরস্কারস্বরূপ সে যাহা চাহিবে, হেরোদ তাহাই দিতে সম্মত—এমন কি, অর্দ্ধেক রাজত্ব পর্য্যন্ত।

পুরস্কারের কথা শুনিয়া সালোমে উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "যাহা চাহিব, তাহাই দিবেন তো?" হেরোদিয়া কন্যাকে মানা করিল; কিন্তু এবার সে নিষেধ-বাণীতে আর ফল হইল না। রাজকুমারী পিতৃব্যকে তিনবার শপথ করাইয়া লইল। প্রথম তাহার নিজের (জীবনের) শপথ, দ্বিতীয় তাঁহার রাজ-মুকুটের শপথ, তৃতীয় দেবতার শপথ। সর্ব্বসমক্ষে দেত্রার্ককে শপথ করাইয়া—সে যাহা চাহিবে, মায় অর্দ্ধেক রাজত্ব পর্য্যন্ত তাহাই দিতে হইবে, এই অঙ্গীকারে মাতার পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও হেরোদিয়ার কন্যা নাচিতে সম্মতা হইল।

হেরোদ পত্নীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "সালোমে যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব চায়, তাহা হইলে তাহাকে 'রাণী' মানাইবে ভাল—তাহার সৌন্দর্য্য-সুষমায় রাজ্ঞীরূপে তাহাকে খুব ভাল সাজাইবে না কি?" বলিতে বলিতে আবার সেই পূর্ব্ব বর্ণিত অশুভ সূচনাগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তেমনি সেই তুষারশীতল বায়ুস্রোতঃ, তেমনিই সেই বিপুল কৃষ্ণকায় বিহগের পক্ষ-বিতাড়ন-শব্দ! হেরোদ ভাবিল, এই পাখীর পাখার বাতাসই বড় শীতল, তাই গায়ে লাগিয়া এত ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। মৃত্যুর পর পাপী যে পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে, তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে। পাপীর নরক-ভোগ-সম্বন্ধে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ইহুদী কাহারও মতভেদ নাই তবে কেহ বলেন, নরকভোগ অনন্ত—কাহারও মতে উহা সান্ত। নরকের কোন অংশে অতি উত্তাপ, কোন অংশ বা অতি শীতল। মৃত্যুর পরে যাহা ঘটে, মরলোকে তাহার সঠিক খবর পঁহুছে না সত্য, কিন্তু জীবিতাবস্থায় বিবেকের তাড়নায় কখনও অনুশোচনা-অনলে দগ্ধ হইয়া, কখনও বা ভবিষ্যৎ শাস্তির অতি-শীতল ভীতিবাত্যায় প্রকম্পিত হইয়া মূঢ় পাপাশয় যে মৃত্যুর পূর্ব্বেই নরক-যন্ত্রণার পূর্ব্বাস্বাদ গ্রহণ করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হেরোদেরও আজ ঘটিয়াছে তাহাই; তাই আজ সে ক্ষণে শীতবাত্যায় প্রকম্পিত, ক্ষণে অসহ্য উত্তাপে উৎপীড়িত। মনোবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ইহাকে নিঃসন্দেহ phobia বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন; কিন্তু প্রাকৃতজন তাহা বুঝিবে কি না সন্দেহ। এই মানসিক বিপ্লবের আর এক ভাবেও অর্থ করা যাইতে পারে। পাপীর এক মুখে দুই কথা—blowing hot and cold at the same breath—তাহার আবার চিত্তের স্থৈর্য্য কোথায়? অতিশয় শৈত্যে দেহ কাঁপিতেছে বলিয়া প্রকাশ করিবার পরক্ষণেই ভীষণ গ্রীষ্ম সহ্য হয় না, প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া উল্লেখ করায় সামঞ্জস্য ত নাই! শেষে গরম-বোধটাই প্রবল হইয়া

পড়িল। হাতে জল ঢালিয়া দাও--গলা শুকাইয়া দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, মুখে তুষারখণ্ড অর্পণ কর—তাড়াতাড়ি অঙ্গাবরণ খুলিয়া ফেল—না না, পরিচ্ছদ যেমন আছে, তেমনি থাকুক—আজ মাথার গোলাপের মুকুট অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে—ফুলগুলি যেন আগুনে তৈয়ারী—কপাল ঝলসিয়া গেল। অনুকরণ-প্রিয়তা পরাধীনের স্বভাব। হেরোদরাজ রোমকভঙ্গীতে ফুলের মুকুট পরিয়া নিমন্ত্রণ-সভায় আসিয়াছিলেন—এখন মুকুটটি মাথা হইতে খসাইয়া—ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—তবে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ধপ্ ধপে মেজের চাদরের উপর লাল পাঁপড়িগুলি যেন রক্ত-চিহ্নেরই ন্যায় বোধ হইতেছিল। যে ব্যক্তি অবলীলাক্রমে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া সিংহাসনে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, গোলাপ যে তাহার নিকট রুধির-পাতদ্যোতনা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? লাল রক্ত যে sadistic কল্পনার সাহায্যকারী, ইহা বিজ্ঞানবিদেরাও অস্বীকার করেন না। হেরোদ নিজেও যে ইহা বুঝেন নাই, তাহা নহে; তাই আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "সবতাতেই symbol বা নিদর্শন দেখা ভাল নহে, তাহাতে জীবন অসহ্য হইয়া উঠে; বরং রক্তচিহ্নও গোলাপদলের ন্যায় সুন্দর, এইরূপ মনে করাই কর্ত্তব্য। হৃদয়ের অন্তস্তলস্থ অস্ফুট চিন্তার অধিরোহণে যখন চিৎশক্তি বিভ্রান্ত হয়, তখন মানসিক প্রবণতার এইরূপ সরান-ঘুরাণ বা readjustment আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিজেই নিজব্যাধির প্রতীকারপন্থা আবিষ্কার করিয়া হেরোদ উদ্বোধন (suggestion) সাহায্যে মনেরগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন—রাজ্ঞীকে বলিলেন, "আমার বড় আনন্দ, আমি এখন বড়ই সুখী—তোমার কন্যা আমাকে নাচ দেখাইতে যাইতেছে। কেমন, আমার সুখী হওয়ার অধিকার নাই কি?" এ কথাগুলির সহিত অবশ্য বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের ঝাঁজও বেশ মিশান রহিয়াছে। শেষে টেট্রার্ক সালোমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি বল সালোমে, তুমি তো আমাকে কথা দিয়াছ—এইবার আমাকে নাচ দেখাইবে তো?" পুনরায় মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রাজকুমারী কহিলেন, "হাঁ, নাচিব বৈ কি।"

হেরোদের জাঁক করাই স্বভাব, তাই বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি কখনও কথার খেলাপ করি না। যাহারা সত্যভঙ্গ করে, তাহাদের দলে তুমি আমাকে পাইবে না। মিথ্যা কথা কাহাকে বলে, জানি না। আমি প্রতিজ্ঞার দাস, আমার বাক্য রাজবাক্য, ইহার কখনও লঙ্ঘন হয় না। সূচ চালুনির ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকে, দাম্ভিকতার ইহাই ধর্ম্ম; তাই টেট্রার্ক প্রবর বলিতে লাগিলেন, "ওই যে কাপাডোবিয়ার রাজাটা, ও শুধু মিথ্যাকথা বলে; ও কাপুরুষ, আসল রাজধর্ম্ম জানিবে কি করিয়া? আমার টাকা পাওনা রহিয়াছে, তাহা শোধ করিবার মৎলব নাই—আবার আমারই দূতকে কি না নানা মন্দ কথা বলিয়া অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়! তা করুক গিয়া, রোমে যাইলে সীজার যে তাহাকে ক্রুশকাষ্ঠে লট্কাইয়া দিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তখন পাষণ্ডকে কৃমিদষ্ট হইয়া মরিতে হইবে। সাধু নিজে যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা কি কখনও মিথ্যা হয়? ভাল

কথা সালোমে, তুমি আর দেরী করিতেছ কিসের জন্য?" সালোমের ক্রীতদাসীগণ তখনও সুগন্ধ দ্রব্যাদি আনয়ন করে নাই—নৃত্যকালে অবগুণ্ঠনের জন্য তাহার সেই সাত সাতটি ওড়না তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই—তখনও তাহার পা হইতে পাদুকা খোলা হয় নাই। সালোমে এই সকল কৈফিয়ৎ দিতে না দিতে দাসীগণ আসিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল।

পাশ্চাত্যগণের নিকট রমণীর যত লজ্জা পায়ে; সুতরাং নগ্নপদে নৃত্য প্রাচীন ইহুদীগণের নিকট না হউক, ভোগাসক্ত আধুনিক সভ্য মানবের নিকট লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। পাশ্চাত্য লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের নাট্যে চিত্রিত প্রাচ্যভূমের এই হেরোদরাজও এ সংবাদে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তাহা হইলে খালি পায়েই নাচিবে তো— পাদুইখানি তো নয়, যেন দুইটি শুভ্র কপোত—যেন তরুশাখায় কুসুম-কোরক বায়ুভরে নৃত্য করিতেছে।" পরক্ষণেই প্রতিবন্ধকের কথা মনে পড়িল। জোর করিয়া চাপা দিতে গেলেও সে চিত্তবেগ বিলুপ্ত হইবে কেন? অকস্মাৎ সুর বদলাইয়া গেল—"তাই তো, রক্ত গড়াইয়া চারিদিক্ ভিজিয়া রহিয়াছে (নারাবথের বিদীর্ণ বক্ষের রুধিরস্রোতঃ তখনও ধুইয়া ফেলা হয় নাই), তাহা হইলে কি রক্তের উপরই নৃত্য করিবে? না, সেটা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এ যে বড় অলক্ষণের কথা।" হেরোদিয়া টিটকারি দিয়া বলিল, "তাহাতে আর আসিল গেল কি? তুমি তো আর রক্তের উপর দিয়া হাঁটিতে কসুর কর নাই!"

বারংবার রক্তের কথা হইতেই হেরোদের মনে পূর্ব্বভাব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। হেরোদ বলিলেন, "কি বলিতেছ? আসিল গেল কি? দেখ, চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখ, রং যেন রক্তের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাধু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, চাঁদ রক্তবরণ হইবে—কেমন? এ কথা কি তিনি বলেন নাই? সকলেই ত শুনিয়াছে, চাঁদের আর রক্ত-রাঙা হইতে বাকী কি? কেন, তোমরা কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না?"

অবিশ্বাস আর উপহাস হেরোদিয়ার চরিত্রের বিশেষত্ব। অবিশ্বাসীরা প্রায়ই উপহাস-পরায়ণ হইয়া থাকে; কিন্তু সে উপহাস কোন ধর্ম্মেরই মূল সত্যে আঘাত করিতে পারে না। গীবন ইতিহাস লিখিতে বসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম লইয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে কি? ধার্ম্মিক খৃষ্টানের নিকট সে ধর্ম্ম অদ্যাপিও অটুট রহিয়াছে। তাই হেরোদিয়ার এ বিদ্রূপে রাজসভাস্থ বিশ্বাসী নাজারিয়েনগণের কোন লোকসানই হইল না—এত কথা শুনিয়াও তাহারা কেহই নিজধর্ম্মমত প্রত্যাহার করিল না। হেরোদিয়ার বিদ্রূপ খাঁটি গন্ধক-দ্রাবকের ন্যায় জ্বালাকর। হেরোদিয়া রাজার কথার জবাবে বলিতে লাগিল,—"দেখিতেছি না আবার? খুব দেখিতেছি।—ওই যে আকাশ হইতে তারাগুলি কাঁচা ডুমুরের মত টুপটাপ করিয়া পড়িতেছে—

কেমন, নয় কি? চাঁদ কেশনির্ম্মিত আধারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণপানা হইয়াছে—পৃথিবীর রাজাদের প্রাণে ভয় ঢুকিয়াছে। আর কিছু না হউক, এই শেষ কথাটা মিথ্যা নহে। সাধুর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অন্ততঃ এই একটি কথা কোন প্রকারে মিলিয়া গিয়াছে—রাজ-অন্তঃকরণে যে ভয় ঢুকিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। না, আর কথায় কাজ নাই—ফিরিয়া চল—তোমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে—রোম নগরীতে লোকে এ কথা শুনিলে, হয় তো বলিবে, তুমি পাগল হইয়া গিয়াছ। আমি বলিতেছি, উঠিয়া চল।" এমন সময়ে পুনরায় ইওকানানের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি বলিতেছিলেন,—"এদম হইতে—বসোরা হইতে—ধূমল বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা কে? কাহাদের বেশ-ভূষার সৌন্দর্য্যে আজ দশদিক্ উজলিয়া উঠিয়াছে—আজ কি জন্য তোমাদের অঙ্গে অরুণবরণ গাত্রবাস দেখিতেছি?" বলা বাহুল্য, এ ইঙ্গিত বিদেশ হইতে আনীত টেট্রার্ক-পত্নীর প্রিয়পাত্রগণের প্রতি। দেশের প্রধানগণ যে তাহাদিগকে দূরীভূত না করিয়া উৎসব-সভায় মিলিত হইয়া তাহাদের সঙ্গেই রাজপুরীর আমোদ-অনুষ্ঠানে মাতিয়াছে, এ জন্য তাহাদের প্রতিও এই প্রচ্ছন্ন কশাঘাত।

হেরোদিয়া আজ কোন মতেই কন্যাকে নাচিতে দিবেন না। হেরোদকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তির গলার আওয়াজ শুনিলেই আমি রাগে আত্মহারা হই। আমার কন্যা নাচিতে থাকিবে, আর ঐ ব্যক্তি ওই রকম করিয়া গালি দিবে, ইহা কখনই আমার অভিপ্রেত নহে। আমাব কন্যা নাচিবে, আর তুমি যে তাহার পানে এমনই করিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, তাহা আমি কোন মতেই হইতে দিব না।" হেরোদ এবার ভীষণ শিষ্টতার সহিত উত্তর দিলেন,—এ উত্তরের প্রত্যেক কথায় খোঁচা—প্রত্যেক কথায় ব্যঙ্গ। রাজ্ঞীকে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে অপমান করার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—"পত্নী আমার—রাণী আমার—তুমি আর গাত্রোত্থান করিও না। তোমার এ কষ্টস্বীকার অনাবশ্যক—উহার নৃত্য না দেখিয়া আমি আব প্রাসাদে প্রবেশ করিব না। নাচ—সালোমে—নাচ—আমায় তোমার নৃত্যকলা একবার দেখাইয়া দাও।" সালোমে ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল—অসঙ্কোচে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সাত ঘোমটার অদ্ভুত নৃত্য দেখাইয়া দিল। এই ঘোমটা লইয়া খেমটা-নাচ যে কিরূপ, অস্কার ওয়াইল্ড তাহার বর্ণনা করেন নাই। বিলাতের রঙ্গমঞ্চে এ নৃত্য হয় তো যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নাট্যোল্লিখিত ঘটনা অপেক্ষাও অধিক রুচিবিরুদ্ধ ও শ্লীলতাহানিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে।

যাক্—নাচ তো হইয়া গেল—রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। হেরোদ নৃত্যের যথেষ্ট তারিফ করিতে লাগিলেন। একবার রাণীর দিকে ফিরিয়া শুনাইয়া দিলেন—"দেখিলে, তোমার মেয়ে আমার জন্য নাচিল কি না?" তার পর, সালোমেকে ডাকিয়া

বলিলেন, "এস, কাছে এস, তোমার পুরস্কার লও। আমি নর্ত্তকীদের ভাল রকমই 'ইনাম' দিয়া থাকি - তোমাকেও সন্তুষ্ট করিব। তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব—কি চাও, একবার বল।"

সালোমে রাজসন্নিধানে নতজানু হইয়া বলিল,—"আমি চাই যে, আমার প্রার্থিত বস্তু আমাকে একখানি রূপার থালে করিয়া এখনই আনিয়া দেওয়া হউক।" প্রার্থিত বস্তু যে কি, তাহা তখনও বলা হয় নাই - শুধু রূপার থালের কথা শুনিয়াই হেরোদ একগাল হাসিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, "রূপার থালে করিয়া তো—সে কথা আর বলিতে হয়—নিশ্চয়ই রূপার থালে করিয়াই আনিয়া দিবে। আজ তোমার কি মোহন রূপ! জুডিয়ার কোন্ যুবতী তোমার সহিত সৌন্দর্য্যে তুলনীয়া? প্রিয়তমে সালোমে সুন্দরি!—বল প্রকাশ করিয়া বল, আজ রূপার থালে করিয়া তোমার জন্য কি উপহার আনিয়া দিবে? আমার যাহা কিছু ধন-রত্ন আছে, সে ত সকলই তোমার। তুমি যাহা চাহিবে - তাহাই তোমাকে আনাইয়া দিব—শুধু একবার বল, তুমি কি চাও।" সালোমে দাঁড়াইয়া উঠিল—বলিল, "আমি ইওকানানের মুণ্ড চাই।" কন্যার এই বর-প্রার্থনায় সালোমের মাতা রাজ্ঞী হেরোদিয়া তাহাকে অশেষ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বাপ্টিষ্ট তাঁহাকে নিন্দাবাদ করিত বলিয়াই সালোমে মাতৃভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এই পুরস্কার চাহিয়া বসিয়াছে। হেরোদ সালোমেকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন—বলিলেন,—"তোমার মার কথা শুনিও না—ও কেবল কুপরামর্শ দিতেই মজবুৎ।" সালোমে বলিল, "আমি মায়ের পরামর্শে এ বর প্রার্থনা করি নাই—নিজের খোসখেয়ালেই চাহিয়াছি। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন - সে কথা যেন ভুলিবেন না।"

হেরোদ আর কি উত্তর করিবেন? বলিলেন, "আমি যে দেবতাদিগের নাম লইয়া শপথ করিয়াছি, তাহা ভুলি নাই। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি সত্য, কিন্তু তোমাকে মিনতি করি, তুমি অপর কিছু প্রার্থনা কর। যাহা চাহিয়াছ, তাহা আর প্রার্থনা করিও না, বরং অর্দ্ধেক রাজত্ব চাহ, তাহাও দিতেছি।"

সালোমে শুনিল না—বলিল, "আমাকে ইওকানানের মস্তক দিতে আজ্ঞা করুন।" হেরোদ অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলে—মায়ে ঝিয়ে—উভয়েই—শপথের কথা লইয়া গোল-মাল বাধাইল। হেরোদিয়া বলিতে লাগিলেন, "সে কি কথা? তুমি জগৎশুদ্ধ লোকের সম্মুখে শপথ করিয়াছ—সকলেই শুনিয়াছে—সকলেই বুঝিয়াছে। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'—এখন আর কথা খেলাপ করিতে গেলে চলিবে কি করিয়া?" মন্থরার সহায়তায় কৈকেয়ী এইরূপেই দশরথের কাছে নিজের প্রার্থনা আদায় করিয়া লইয়া-ছিলেন। পত্নীর এ ওকালতীতে হেরোদ চটিয়া গেলেন, বলিলেন, "তোমার সহিত কথা কহিল কে? তুমি চুপ কর।" রাজা রাণী উভয়েই সমানে সমানে যান। নৃত্যকালে

রাজা মাতার বিরুদ্ধে কন্তাকে সমর্থন করিয়াছিলেন—রাণী এখন তাহার শোধ তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, "সালোমে উহার শির লইতে চাহিয়াছে—বেশ করিয়াছে। ও কি আমাকে কম অপমান করিয়াছে? কত ভয়ঙ্কর কুৎসা আমার নামে রটনা করিয়াছে। মেয়ের মায়ের উপর এত টান—সে এ সব সহ্য করিবে কেন? না সালোমে, তুমি ছাড়িও না—ও যে শপথ করিয়াছে—দেখি, এড়ায় কি করিয়া?"

হেরোদ রাণীকে পুনরায় ধমক দিলেন—বলিলেন, "তুমি চুপ কর, আমার সহিত কথা কহিও না" এই বলিয়া সালোমেকে অনুনয়ের পরিবর্ত্তে সমঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দেখ, সব কাজ বুঝিয়া করিতে হয়; নয় কি? বুঝিয়া না দেখিয়া কোন কাজই করিতে নাই। আমি তোমাকে চিরদিন ভালবাসিয়াছি—আদর করিয়াছি—একদিনের জন্তও কঠোর ব্যবহার করি নাই, বরং আমার স্নেহ-আদরের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত রকমই হইয়া থাকিবে। তাই বলিতেছি, এ বরটি আমার কাছে প্রার্থনা করিও না—এ যে ভীষণ লোমহর্ষক ব্যাপার! মানুষের কাটামুণ্ড—সে কি আর একটা দেখিবার মত জিনিস? তাহা যে কুৎসিত কুদৃশ্য—কুমারীর এ সব দেখিতে নাই। ইহাতে তুমি কি আনন্দ পাইবে?—না—না, এ আর চাহিও না, বরং আমি যাহা বলিতেছি, শুন। আমার একখানি পান্না আছে—বেশ সুবৃহৎ গোলাকার পান্না; এত বড় মরকতমণি জগতে আর নাই। সীজারের প্রিয়জন আমাকে ইহা পাঠাইয়া দিয়াছে। (১) আড়ভাবে ধরিয়া ইহার ভিতর দিয়া দেখিলে অতিদূরের দৃশ্যও স্পষ্ট দেখা যায়। স্বয়ং সীজার এমনই একখানি মহামরকত সঙ্গে করিয়া সার্কাস দেখিতে যান; (২) কিন্তু তাঁহার রত্নটি আমার পান্নার মত বড় নহে। তোমার কি

---

(১) যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব রোমক সম্রাট্ অগষ্টাস Augustus ও টাইবেরিয়াসের Tiberius যুগে। তখন রোমের রাজপ্রাসাদে সম্রাটের স্ত্রী ও পুরুষ (fovourites) প্রণয়াস্পদগণের উপদ্রব নীরোর যুগের ন্যায় অধিক না হইলেও একবারেই যে বিদ্যমান ছিল না, তাহা বলা যায় না।

(২) পান্না-খণ্ডটি বোধ হয়, আধুনিক opera glassএর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। Optics শাস্ত্রসঙ্গত আকৃতিবিশিষ্ট কোনও মণি বা উপলখণ্ড যে দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সম্রাট্ ভেস্পেসিয়ান (Vespasian) নির্ম্মিত রোমের সুবিস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্র (circus) কলিসিয়ম (Coliseum) যাঁহারা চিত্রাদিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, ক্রীড়াদর্শনকালে দর্শকগণের এরূপ দ্রব্যব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিংবা গ্রন্থকার হয় তো বলিতে চাহেন যে, এ মরকতখানি 'মহামরকত'-শ্রেণীর। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে, 'মহা' গুণবিশিষ্ট মরকত সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে সমস্ত

এ পান্না লইতে ইচ্ছা হয় না ? যদি চাহ তো বল, এখনি তোমাকে আনিয়া দিতেছি।”

শ্রীভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র।

গৃহকে প্রভাপরিপূরিত করে। (গরুড়পুরাণ ৭১ অধ্যায়, ডাক্তার রামদাস সেনা-প্রণীত রত্নরহস্যে উদ্ধৃত)। যুক্তিকল্পতরুকারের মতেও “যে মণি হস্তে স্থাপিত হইয়া সূর্য্যকিরণস্পর্শে স্বীয় কিরণে সমুদয় স্থান রঞ্জিত করে, তাহার নাম মহামরকত। হয় তো মণির এই বিশেষ গুণদ্যোতনার জন্যই ইহার প্রভাবে দূরসংস্থিত দৃষ্ট পদার্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষীকরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

জীবন-নাট্য

(১)

রমণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। হাঁ, গীতধ্বনিই বটে। ভাল শুনা যাইতেছিল না; সে ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বের বাড়ীতে তানপুরা সহযোগে কেহ রাগিণী আলাপ করিতেছে। না—এ ত শিক্ষানবীশের কণ্ঠস্বর নহে! বিলাসী, খেয়ালী গায়কের কণ্ঠ হইতে এমন সুরতাল-লয় বাহির হইতে পারে না। রাগিণীর এমন মধুর, বিচিত্র আলাপ, অর্দ্ধ-শিক্ষিতের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। কি লীলায়িত গতিতে রাগিণী, গায়কের পরিপূর্ণ কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছিল!

রেলিঙের লৌহদণ্ড ধরিয়া রমণী পিপাসুচিত্তে গান শুনিতে লাগিল। শরতের নির্ম্মল আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। অদূরে, সিকতা-বিস্তারের পর যমুনার কালো জল ছল-ছল করিয়া ললিত নৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। পরপারে নিস্তব্ধ গাছপালা আলোক-প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে। এমন মধুর রজনীতে, নিশীথকালে সাধকের সঙ্গীতালাপ রমণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় শুনিতে লাগিল।

সহস্র দীপালোকিত কক্ষ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিতদীপ্তি হইলে যেমন গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়, গায়কের রাগিণী-আলাপ শেষ হইলে রমণীর অবস্থাও ঠিক তেমনই হইল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল।

হাঁ, কা'ল সে নিশ্চয়ই এই গায়কের সন্ধান লইবে। ব্রজেশ্বরের নিত্যধাম বৃন্দাবনে আসিয়া সে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীত-বিশারদ কোনও সাধকের সন্ধান সে পায় নাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজ তাহার বাসার পার্শ্বেই এমনই এ কজন গুণী গায়কের সন্ধান আপনা হইতেই মিলিয়া গিয়াছে, ইহাকে অবশ্যই শুভগ্রহ বলিতে হইবে।

বৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানীতে যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হইয়া সে বহুবার শাস্ত্রানুসারে সঙ্গীতবিদ্যা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, কোনও ওস্তাদ তাহাকে সাধন-মন্ত্র শিখাইতে সম্মত হয় নাই! অর্থ-লোভে যাহারা শিখাইতে আসিত, তাহাদের বিদ্যা অসমাপ্ত। হিন্দু সঙ্গীতের ভাঙ্গা-চূরা রাগ-রাগিণী লইয়াই তাহাদের কারবার। কিন্তু সে শিক্ষা তাহারও ত কম ছিল না প্রকৃতিদত্ত মধুর কণ্ঠ তাহার ছিল, গানও সে ভালই গাহিতে পারিত। রঙ্গালয়ে প্রতিদিন সহস্র দর্শক তাহার অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শন ও মধুর গীত শুনিবার জন্যই আসিত; কিন্তু সঙ্গীতবিদ্যা

সে যে ভাবে আয়ত্ত করিতে চাহে, তাহার শিক্ষা যে তাহার হয় নাই। বাঙ্গালায় প্রকাশিত সঙ্গীতশাস্ত্র পড়িয়া গূঢ়তত্ত্বও সে ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সে চাহে সাধনলব্ধ সঙ্গীতবিদ্যা। কিন্তু যাহারা তাহাকে এ বিদ্যা শিখাইতে পারিত, তাহাদের কেহই তাহার মন্ত্র-গুরু হইতে সম্মত ছিল না।

কেন?—সে নারী, বিপথগামিনী, এই তাহার অপরাধ। সে পতিতা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি সঙ্গীতের সাধনা করিবার অধিকারও তাহার থাকিবে না? সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধকগণ এই শ্রেণীর নারীকে এ বিদ্যা শিখাইতে এত কুণ্ঠিত কেন? সদুত্তর সে কোথাও পায় নাই। শুধু সংক্ষিপ্ত প্রত্যাখ্যানই সে পাইয়া আসিয়াছে। 'আউরৎকে' তাঁহারা এ বিদ্যা দান করিতে পারেন না, কুবেরের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও নহে। কিন্তু কেহ কেহ ত এ বিদ্যালাভ করিয়াছে! হাঁ, তাহা সত্য; কিন্তু কেমন করিয়া তাহারা শিখিয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না।

পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানের চিত্র আজ তাহার মনে দুঃস্বপ্নের মতই উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনের কাহিনীও চোখের উপর বায়স্কোপের ছবির মত আকার ধারণ করিয়া ভাসিয়া উঠিল। বাল্যের সেই মধুরস্মৃতি। মাতৃহীনা বালিকা পিতার স্নেহক্রোড়ে লালিত হইতেছিল। কোনও সঙ্গীত-রসজ্ঞ ধনবানের তিনি সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। নিয়মিত কর্ম্মের পর, অবসরকালে তিনি তাহাকে স্বয়ং পড়াইতেন, গান শিখাইতেন। সংসারে অন্য কোন আত্মীয় তাহাদের ছিল না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিত। পরিচারিকা গৃহকর্ম্ম করিত। অনেক দিন বড় সুখেই তাহাদের কাটিয়াছিল। তার পর সে ক্রমে বড় হইতেছে দেখিয়া তাহার পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সুপাত্রের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারিত। যে জমীদারের তিনি সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার পিতা কর্ম্মচ্যুত হইলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ অল্প বেতনে আর কোথাও চাকরী লইতে সম্মত হইলেন না। অভিমানে তিনি স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। সে দিনের স্মৃতি মনে করিতে রমণীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল।

গ্রামের নির্জ্জনপ্রান্তে তাহাদের পরিষ্কৃত পর্ণ-কুটীর। সঞ্চিত অর্থ ও জোতজমার সাহায্যে স্বচ্ছন্দে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইতেছিল। অনেক চেষ্টায় পাত্র মিলিল। বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু হতভাগীর অদৃষ্টাকাশে যে গ্রহ বিরাজ করিতেছিল, সে তাহাকে এ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিতে দিল না। জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক আরম্ভ না হইতেই অকস্মাৎ যবনিকা নামিয়া আসিল। রঙ্গমঞ্চের প্রজ্বলিত দীপমালাও নিভিয়া গেল।

সে দিনের স্মৃতি সে এ জীবনে ভুলিবে না। ডাকঘরের ছাপ-মারা চিঠি পড়িয়া, তাহার পিতা যখন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া মুণ্ডহীন বলির পশুর মত ছটফট্ করিতেছিলেন, ওঃ! সে কি নির্ম্মম দৃশ্য!

তার পর?-তার পর কাল-বৈশাখীর ঝটিকায় সবই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। জীবনের

শেষ আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, তাহার স্নেহময় পিতা অনির্দ্দিষ্টরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। নির্ব্বান্ধব জগতে সে একা। পিতৃকুল, মাতৃকুলে কেহই ত ছিল না। শ্বশুরকুলও সেইরূপ। জ্ঞাতি দেবর একজন ছিল, সেও কিশোরী বিধবার কোন তত্ত্ব লইল না।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, তাহার কর্ম্মফল তাহাকে সেই পথেই লইয়া গেল। নিশীথ-রাত্রিতে শোক-নৈরাশ্য-ম্লান মনটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে সেতার লইয়া আপন মনে গান গাহিত। প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা হরির মা তাহার কাছে শয়ন করিত। যৌবন ক্রমেই তাহার দেহে সৌন্দর্য্যের সকল প্রকার আভরণ আনিয়া দিতেছিল। গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল যুবক-সম্প্রদায় অভিভাবকহীনা সঙ্গীতানুরাগিণী বিধবাকে আয়ত্ত করিবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার নিকট হইতে উৎসাহ না পাইয়া শেষে তাহাদের অনেকেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাহার অনেক বিবরণও সে জানিতে পারিয়াছিল। তথাপি পরিণামে সঙ্গীতরসপিপাসু কোনও শিক্ষিত যুবকের কৌশলজাল সে এড়াইতে পারে নাই। ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশে, সঙ্গীত শিখাইবার ছলনায় এই শিক্ষাভিমানী যুবক কেমন করিয়া তাহাকে কূল হইতে একেবারে অকূলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহার সমস্ত ইতিহাসই ত তাহার জীবনপটে লিখিত হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলতার অপরাধ তাহারও ছিল; কিন্তু চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা কত কঠিন, তাহা ত সে ভালরূপেই জানে।

তার পর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে যাহা হয়, তাহার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে। নানারূপ অবস্থাবিপর্য্যয়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সে এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—যেখান হইতে সে আপনার ভবিষ্যৎকে দেখিতে পাইয়াছে। বাল্যের সঙ্গীতানুরাগ, তাহার জীবনযাত্রার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। ক্রমশঃ তাহা আর বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এবং প্রমোদ ভবনের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। সঙ্গীতশাস্ত্র রীতিমত আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণে প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, তাহারা যে ভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া আসিতেছে, তাহাতে রস, মাধুর্য্য থাকিতে পারে; কিন্তু রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে গেলে 'গানে'র বিলাসে তাহা হইতে পারে না। রীতিমত সাধনা দ্বারা, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিলে সঙ্গীত-রসরাজ্যের অধিকার-লাভ অসম্ভব। তাই ব্যাকুল-প্রাণে সে সেইরূপ সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ সাধকের দ্বারা দীক্ষিতা হইতে চাহে; কিন্তু এমনই তাহার অদৃষ্ট, পতিতা নারীর গুরু হইতে কেহই চাহে না।

আজ যে সাধকের সন্ধান সে পাইয়াছে, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া সে তাঁহার শিষ্যা হইবার চেষ্টা করিবে। সঙ্গীতই যে তাহার ব্যর্থ জীবনের এখন একমাত্র অবলম্বন। উহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতেই হইবে।

দূরে কোতোয়ালীর ঘড়িতে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। রমণী উঠিয়া

দাঁড়াইল। চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টি বাহিরের আলোকপ্লাবিত স্তব্ধ প্রকৃতির ছবি দেখিয়া আবার কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে দীপাধারের আলোক কমাইয়া দিয়া সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(২)

"দিদিমণি, বেলা যে ঢের হয়েছে, উঠ্‌বে না?"

দ্বারে করাঘাত ও পরিচারিকার ডাকইাকে মণিমালা তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাই ত! অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে! খোলা জানালা দিয়া সূর্য্যের আলোক-ধারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

দ্বার খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

বৃদ্ধা বিন্দী কলিকাতা হইতে মণিমালার সঙ্গেই আসিয়াছিল। সে অনেক দিন হইতেই তাহার কাছে কাজ করিতেছে। সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও দ্বারবান্ তাহাকে মাইজী বলিয়া সম্বোধন করে; কিন্তু বিন্দী তাহাকে প্রথম হইতে দিদিমণি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে অভ্যাস বৃদ্ধা ত্যাগ করিতে পারে নাই। দ্বারবান্ ও ভৃত্য মণিমালার জীবনের ইতিহাস জানিত না। তাহারা নূতন চাকরী লইয়াছে।

বিন্দী বলিল, "নাইবে না? সকলে মন্দিরে গিয়াছে। তাড়াতাড়ি নেয়ে নিয়ে চল, গোবিন্দজীর মন্দিরে যাই।"

প্রত্যহ প্রাতঃস্নান-শেষে মণিমালা গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইত। বৃন্দাবনে আসিয়া ইহা তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। কলিতাতার জীবনযাত্রা এই বয়সেই তাহার নিকট নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই সে কিছুকাল বৃন্দাবনে কাটাইয়া যাইবে বলিয়া এখানে আসিয়াছে। অন্য উদ্দেশ্যও ছিল, যদি এখানে সে সত্যই কোন হিন্দু-সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদের মন্ত্র-শিষ্যা হইতে পারে।

তাহার ঘৃণিত, নির্লজ্জ জীবনযাত্রার সমস্ত কাহিনী বিন্দী জানিত; জানিয়াও সে এই সুন্দরী নারীর অনুরাগিণী ছিল। এজন্য মণিমালা তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহারও এই বিরাট্ বিশ্বে দ্বিতীয় আত্মীয় কেহ ছিল না।

বৃন্দাবনে সে ভোগলিপ্সা লইয়া আসে নাই, নিবৃত্তি স্পৃহাই মনে জাগিতেছিল। সেজন্য এখানে আসিয়া সে কাহারও সহিত মিশিত না। দ্বারবানের উপর আদেশ ছিল, তাহার বিনা অনুমতিতে কেহ যেন তাহার সহিত দেখা করিতে না পারে।

মণিমালা বলিল, "বিন্দি! দেখে আয় ত, আমাদের পাশের বাড়ীতে কে থাকে?"

"এখনি যেতে হবে না কি? মন্দির থেকে ফিরে এসে গেলে হবে না?"

গম্ভীর-স্বরে মণিমালা বলিল, "না, আগে খবর নিয়ে আয়।"

গজ্-গজ্ করিতে করিতে বুড়ী নীচে নামিয়া গেল। মণিমালা তদবস্থায় জানালার

ধারেই দাঁড়াইয়া রহিল। বানরের উৎপাতের জন্ত ঘরের জানালা-বারাণ্ডা সমস্তই লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। যমুনার জলে স্নানার্থী নরনারীরা নামিয়া অবগাহন-স্নান করিতেছে। মণিমালা কি শুধু তাহাই দেখিতেছিল?

খানিক পরে বিন্দীর কণ্ঠস্বরে রমণী ফিরিয়া চাহিল।

বিন্দী বলিল, "পাশের বাড়ীতে একজন ওস্তাদ এসেছে।"

"কোন্ দেশে বাড়ী, তা জেনেছিস্?"

বিন্দী তাহার মনিবের অভিপ্রায় জানিত। গান শিখিবার জন্ত মণিমালার প্রগাঢ় আগ্রহের সকল সংবাদই তাহার জানা ছিল। সে বলিল, "তার একটা চাকর শুধু আছে। সে বল্লে, বাড়ী গোয়ালিয়ার, ওস্তাদজী এখন বাড়ী নেই।"

"বাড়ী নাই, কখন্ আসিবেন, তাহা জনিয়াছিস্?"

"সে তা বল্‌তে পার্‌লে না। তবে ওস্তাদজী এখন এখানে কিছুদিন থাক্‌বে, সেটা শুনেছি।"

"আচ্ছা চল্, স্নান ক'রে মন্দিরে যাওয়া যাক্।"

(৩)

মণিমালা প্রত্যহই লোক দ্বারা সন্ধান লয়, কিন্তু প্রতিবেশী গায়ক বাড়ী নাই, এই সংবাদই রোজ পায়। সন্ধানে সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, তিনি ব্রজপরিক্রমণ করিতেছেন। চাকর তাঁহার দ্রব্যাদি আগুলিয়া বাসায় রহিয়াছে। মণিমালা ক্রমেই চঞ্চল হইয়া পড়িতেছিল। তাহার উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হইবে, মনোবাসনা পূর্ণ হইবে কি? জীবনে তাহার আর কোন সাধ নাই, সঙ্গীত—শুধু সঙ্গীত। এই শাস্ত্রটাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেই এজন্মের সকল সাধ তাহার মিটিয়া যায়। নারীত্বের সমস্ত গৌরব, সমস্ত দীপ্তি তাহার চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। তাহার দেহে এখনও রূপের জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িতেছে সত্য, পরিপূর্ণ যৌবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেহতটে অবিশ্রান্ত আঘাত করিতেছে, ইহা সত্য, কণ্ঠস্বরে সুধাধারা গলিয়া পড়ে, তাহাও মিথ্যা নহে; কিন্তু তবু নারীর যাহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, তাহা ত সে চিরতরে হারাইয়াছে! পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও তাহা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। ইহা বিধিলিপি, না কর্ম্মফল? কে জানে!

পাঁচ ছয় দিন পরে একদা সন্ধ্যার সময় সে জানিতে পারিল, ওস্তাদজী পীড়িত-শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ চারিদিন তাঁহার জ্বর। সঙ্গীরা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া গিয়াছে।

মণিমালা নীরবে সমস্ত শুনিল। তার পর গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। সে কি করিবে? অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা, বিশেষতঃ এ অবস্থায়, সঙ্গত

নয়। কিন্তু তাহার পক্ষে ইহা একটা সুযোগ নহে কি? প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা ত আছেই। এই শ্রেণীর সাধকগণ যে সাধারণতঃ নারীবিদ্বেষী, তাহা সে জানিত। তবে—

মণিমালা আর ইতস্ততঃ করিল না। সে বেশ-পরিবর্ত্তন করিল। রঙ্গালয়ে অভিনয়-কালে নানারূপ বেশ-ধারণ করা তাহার অভ্যাস ছিল। সে সহজেই পশ্চিমাঞ্চলের নারীর পরিচ্ছদে ভূষিতা হইল। পূর্ব্বে ইচ্ছা করিয়া সে হিন্দী শিখিয়াছিল। সঙ্গীতশাস্ত্র অনু-শীলনের জন্য হিন্দী ভাষার কয়েকখানি গ্রন্থও সে যত্ন পূর্ব্বক পড়িয়াছিল। অনায়াসে সে চমৎকার হিন্দী বলিতে পারিত। আজ সে অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য উহাকে কাজে লাগাইবে।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ওড়না দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া মণিমালা পথে বাহির হইল। পার্শ্বের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, নীচের তলার ঘরে বসিয়া এক ব্যক্তি সিদ্ধি বাটিতেছে। সে সম্ভ্রান্ত-পরিচ্ছদধারিণী নারীকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।—"মাইজীর কি প্রয়োজন?"

মণিমালা বুঝাইয়া দিল যে, ওস্তাদজীর পীড়ার কথা শুনিয়া সে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তাহার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পথ চিনিয়া নিজেই যাইতে পারিবে।

রমণী গাম্ভীর্য্যভরে দ্বিতলে আরোহণ করিতে লাগিল। ভৃত্য কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া আবার স্বকার্য্যে মন দিল।

মণিমালা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল, সম্মুখের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ধীরে ধীরে রুদ্ধপ্রায় দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। পরিচারিকার দ্বারা পূর্ব্বেই সে অপরিচিত গায়কের সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা জানিয়া লইয়াছিল।

(৪)

দরজা খোলার শব্দে শয্যাশায়ী রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মৃদু দীপালোকে দ্বারপথে শুভ্র-পরিচ্ছদধারিণী নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে প্রথমে চমকিয়া উঠিল। জ্বরতপ্ত ললাটে হাত দিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "কে?"

মস্তকের ওড়না সরাইয়া ধীরপদক্ষেপে নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরে বলিল যে, সে তাহারই প্রতিবেশিনী। তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া সে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। রোগীর সেবা করাই তাহার ব্রত।

শয্যাশায়ী পুরুষ, এরূপ শুশ্রূষাকারিণী সম্বন্ধে গল্প বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। অনেক নারী সেবাব্রত লইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে অথবা সামরিক হাসপাতালে আজকাল কাজ করিয়া থাকে, এমন অনেক কথাই সে ইতিপূর্ব্বে বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনিয়াছিল অথবা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিল। তাই সে মণিমালার কৈফিয়তে বোধ হয় অবিশ্বাস করিল না।

ক্ষীণ-কণ্ঠে সে বলিল, "আপনার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু বর্ত্তমানে আমার রোগ এত

কঠিন নহে যে, আপনাদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হইবে। কষ্ট করিয়া আপনি আমায় দেখিতে আসিয়াছেন, এজন্য ধন্যবাদ।"

মণিমালা যতটা প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা করিয়াছিল, ওস্তাদের ব্যবহারে ঠিক ততটা রূঢ়তা নাই দেখিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল। সে সত্যগোপন করিয়াছে, প্রকৃত আত্মপরিচয় লুকাইয়াছে; বাধ্য হইয়াই, স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্যই এ পথ তাহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যতদিন পারা যায়, এই অভিনয় তাহাকে চালাইতেই হইবে।

মণিমালা প্রদীপের আলোক একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, মধুর ভঙ্গীর সহিত অসঙ্কোচে শয্যার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমাদের কর্ত্তব্য, রোগীর কষ্টের লাঘব করা। আপনার হয় ত প্রয়োজন এখন নাই; কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য, রোগীর সন্ধান পাইলেই সেখানে গিয়া সেবা-শুশ্রূষা করা। এ কাজ না করিলে আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব।"

রোগী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। অপরিচিতা নারীর মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া কি তাহার মনে ভাবান্তর হইয়াছিল? হাঁ, এ মুখ দেখিবার মত; ব্যবহারের শালীনতা প্রশংসনীয়। কোন শুশ্রূষাকারিণী, সেবাব্রতধারিণী নারীর সহিত এ পর্য্যন্ত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। যদি তাহারা এইরূপ মধুরভাষিণী, সুগঠিত-দেহা হয়, তাহাদের ব্যবহার এই প্রকার শিষ্টতাব্যঞ্জক এবং সংযত দেখা যায়, তাহা হইলে রোগী বাস্তবিকই শুশ্রূষাগুণে শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে।

এখন জ্বরের যন্ত্রণা তাহার অধিক ছিল না। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা সত্যই পীড়িতের উপকার করেন। আপনার ব্যবহারে আমি কৃতজ্ঞ। তবে আজ আমার পীড়ার কষ্ট তেমন নাই। আজ আপনাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি যাইবার সময় আমার চাকরকে একবার ডাকিয়া দিয়া যাইবেন।"

মণিমালা বুঝিল, অন্যান্য লোকের অপেক্ষা এই ব্যক্তির কথা বলিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা শুনিয়া সে বুঝিল, শুধু সঙ্গীতশাস্ত্র নহে, ভাষাজ্ঞানও ইহার প্রশংসনীয়। সে আজ আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না, অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত-মনে ধীরে ধীরে সে নীচে নামিয়া গেল।

(৫)

শুশ্রূষাকারিণীর অভিনয় রীতিমত চলিতে লাগিল। প্রত্যহ দুই বেলা মণিমালা রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইত। সঙ্কোচের প্রথম আবরণ সরিয়া গেলে, তার পর অতি সহজেই কার্য্য গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়। রোগীর প্রথম সঙ্কোচ যখন অন্তর্হিত হইল, তখন সে এই সেবারতা নারীর শুশ্রূষা-গ্রহণে আর কুণ্ঠিত হইল না। একে একে বাধাগুলিও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। চিকিৎসক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা

করিয়া যাইতেন। মণিমালা ভৃত্যকে ইতিমধ্যেই বশ করিয়া ফেলিয়াছিল। মধুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি রজতচক্রের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে অনেক দুরূহ ব্যাপারও সরল হইয়া আসে। ডাক্তার যেমন বলিয়া যাইতেন, ভৃত্যের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইয়া মণিমালা সেইভাবে শুশ্রূষা চালাইত। ডাক্তার যখন আসিতেন, মণিমালা তখন ত সেখানে থাকিত না।

বিন্দী বুড়ী মণিমালার অত্যন্ত বিশ্বস্তা পরিচারিকা। তাহাকে মণিমালা সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। সে যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আপাততঃ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহার জীবনের কোনও ঘটনা বৃন্দাবনের কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহা অভিনয় বটে ; কিন্তু সে অভিনয় চালাইয়া যাইতেই হইবে। বুদ্ধিমতী পরিচারিকা ইঙ্গিত বুঝিয়াই চলিতে জানিত। অতিরিক্ত আভাষ পাইয়া সে আরও সতর্ক হইল।

রোগী দেখিল, এই নারীর শুশ্রূষার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ঔষধ ও পথ্য যথাসময়ে ত পাওয়া যায়ই, অধিকন্তু যেটির যখন অভাব অনুভূত হয়, না চাহিতেই তাহা পাওয়া যায়। গৃহের শ্রী ত ফিরিয়া গিয়াছেই, শয্যাও সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন। শুশ্রূষাকারিণী নারীর প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে অনেক রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রৌঢ়ত্ব এখনও তাহার দেহে আপনার অধিকার দাবী করিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কাল ত তাহার হিসাব দাখিল করিয়া যাইতেছে। এত বয়সেও বাস্তবিকই সে এ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে পায় নাই।

দুই চারিদিন সেবা পাইবার পর রোগীর এমন অভ্যাস দাঁড়াইল যে, মণিমালার নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে সে চঞ্চল হইয়া পড়িত। অথচ প্রথম দিন সে ইহার সেবা লইতে অনিচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিল! মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই।

একদিন মাথার যন্ত্রণা প্রবল হইলে, মণিমালা তাহার মস্তকে ব্যজন করিতেছিল। অনেকক্ষণ ব্যজনের পর একটু সুস্থ হইলে মণিমালা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনার আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা পাইলে সেখানে সংবাদ দেওয়া যায়। অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ নাই, তবে যদি সেবা-শুশ্রূষার———"

রোগী মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "কাহাকে সংবাদ দিব? এ দুনিয়াতে আমিই আমার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু! কেহ নাই, আমার আপনার বলিবার কেহই নাই! শুধু ঐ সেতার আমার অবলম্বন!"

মণিমালার হৃদয় এই নির্ব্বান্ধব রোগীর মনের বেদনা বুঝিল। সেও ত এই বিরাট্ বিশ্বে একা, নির্ব্বান্ধব—সঙ্গিহীন! বন্ধনহীন জীবন কত দুঃখের, তাহার পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছে। ভালবাসিবার, স্নেহভক্তি করিবার আধার যাহাদের নাই, তাহাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে?

(৬)

সেবাশুশ্রূষার গুণে জান্‌কীপ্রসাদ শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে পূর্ব্ববল ফিরিয়া পাইল। মণিমালা ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছিল, এই প্রসিদ্ধ গায়ক মধ্যভারতের কোনও মহারাজের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। একবৎসর হইল, সংসারের অবশিষ্ট অবলম্বন একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া সে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পৃথিবীতে যাহা অত্যন্ত অসুন্দর, সর্ব্বদা তাহার সাহচর্য্যতায় পরিণামে তাহাকে ততটা কুৎসিত মনে হয় না ; স্বভাবতই যে বিষয়ে বীতস্পৃহতা থাকে, তাহার সহিত অনুক্ষণ সংস্রব থাকিলে তাহার বীভৎসতা ক্রমে দূরীভূত হয়, ইহা মানব-মনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম।

জান্‌কীপ্রসাদ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সারা জীবন সঙ্গীতের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। সংযম নহিলে সঙ্গীত-শাস্ত্রে অধিকার জন্মে না। বাল্যকাল হইতে গুরুর নিকট সে এই কথাই শিখিয়াছিল। সংযমী সাধক না হইলে রাগ-রাগিণী তাহার কাছে ধরা দেয় না, সঙ্গীতশাস্ত্র-পাঠে ইহাও সে জানিয়াছিল। জীবনের অভিজ্ঞতাতেও সে দেখিয়াছে, যোগমার্গভ্রষ্ট কোনও সঙ্গীত-সাধক জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং ভোগবিলাস ও ব্যভিচারকে সে সর্ব্বদাই এড়াইয়া চলিত। নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবেও সে কখনও আসে নাই। গুরুর আদেশে সে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু একটি সন্তান রাখিয়া অল্পবয়সেই সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বস্, তার পর জান্‌কীপ্রসাদ নারীর ছায়া আর মাড়ায় নাই।

কিন্তু মণিমালার ব্যবহারে তাহার পূর্ব্ব-ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। নারীর ছায়া-স্পর্শেও যে পাপ, ইহা সে আর কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিতের জন্যও যাচিয়া সেবা-ভার গ্রহণ করে, তাহারা অনেক উচ্চস্তরের জীব। এমন নারীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক যে!

সুতরাং মণিমালাকে সে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রদ্ধা হইতে অনেক ক্ষেত্রে মনের অবস্থা শেষে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, মানব-মনোবৃত্তির যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাহা হয় ত তাঁহারাই জানেন। জান্‌কীপ্রসাদের মনের অবস্থা রূপান্তরিত হইতেছিল কি না, সকলের যিনি অন্তর্যামী, তাহা তাঁহারই গোচরীভূত ছিল। তবে সুস্থ হইয়া সে যে প্রায়ই প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিত, তাহা দ্বারবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া মণিমালাও জানিত।

মিতভাষিণী, সুন্দরী নারীর সহিত দেখা করিতে গিয়া সে প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল, এই যুবতী শুধু বুদ্ধিমতী নহে, শুদ্ধাচারসম্পন্না এবং সঙ্গীতানুরাগিণী। সেবা-শুশ্রূষাই যে ইহার একমাত্র কাম্য, তাহা নহে ; সঙ্গীতকলার চর্চ্চায় ইহার একান্ত আগ্রহ এবং চেষ্টা আছে।

অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর পরিচয় সে এইটুকুই পাইয়াছিল। কি উদ্দেশ্যে এই বয়সে

ধনবতী হইয়াও সে বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। আত্মীয়স্বজন, পিতা বা স্বামী কেহ আছে কি না, তাহা জানিবার ইচ্ছা সত্বেও সে এইমাত্র বুঝিয়াছিল, এই নারী তাহারই মত সংসারে একাকিনী। যথেষ্ট অর্থ আছে, লোক-সেবায় এবং সঙ্গীত-চর্চ্চায় তাহার আনন্দ। কৈফিয়ৎ চাহিবার কেহ নাই, দিবার প্রবৃত্তিও বোধ হয় নাই।

(৭)

মণিমালা বিশেষ সতর্কভাবে অগ্রসর হইতেছিল। অভিনয়ে তাহার দক্ষতা ছিল। কিন্তু তথাপি সে যে বঙ্গরমণী, সে কথাটা সে জানকীপ্রসাদের কাছে গোপন করিতে পারিল না। উহা লুকাইবার জন্য ইদানীং তাহার আগ্রহও তেমন ছিল না। সে বুঝিয়াছিল, জানকীপ্রসাদ তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। যদি সে জানিতে পারে যে, মণিমালা বাঙ্গালিনী, তাহা হইলে তাহার শ্রদ্ধা তাহাতে হ্রাস পাইবে না। তবে কখনও কখনও সে পশ্চিমদেশীয়া রমণীর পরিচ্ছদ পরিয়াও জানকীপ্রসাদের সহিত দেখা করিত। সেটা তাহার শুধু খেয়াল নহে, কৌশলও বটে।

তাহার কৌশলজাল নিষ্ফল হইল না। জানকীপ্রসাদ সম্ভবতঃ তাহাতে মনে করিয়াছিল, এই নারীর মনে জাতিবিদ্বেষ নাই।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই উপকারকের মিষ্ট অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না। অন্ততঃ জানকীপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তি ত পারেই না। তাই একদিন মণিমালা মিষ্ট হাসিয়া যখন ওস্তাদের গান শুনিতে চাহিল, তখন বেচারা জানকীপ্রসাদ তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিল না।

তার পর কৌতূহলভবে জানকীপ্রসাদও একদিন মণিমালাকে গান গাহিতে মিনতি জানাইল। সম্ভ্রমবোধ তাহার খুবই ছিল, এজন্য একটু সঙ্কোচের সহিতই সে প্রস্তাব করিয়াছিল। মণিমালা এই সুযোগই খুঁজিতেছিল। সে বিন্দুমাত্র চপলতা প্রকাশ না করিয়াই, শান্ত, শিষ্ট ছাত্রীর ন্যায় সেতার লইয়া গান ধরিল।

আকাশে সে দিন মেঘের আড়ম্বর ছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি বেশ নামিয়া আসিল। মণিমালার মধুর কণ্ঠোত্থিত স্বরলহরী উচ্চসপ্তকে উঠিল। গান শুনিয়া জানকীপ্রসাদ তারিফ করিল বটে, তবে রাগিণীর কোথায় কি দোষ ঘটিয়াছে, তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত হইল না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এমন মধুর কণ্ঠের গান সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মণিমালা জানাইল, তাহার পিতার নিকট হইতে সে সঙ্গীতের যৎসামান্য মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। তিনি সাধক ছিলেন, আজ বাঁচিয়া থাকিলে সঙ্গীতের শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ হইতে পারিত। তার পর যতটুকু সে

শিখিয়াছে, তাহা সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সাহায্যে ঠিক হয় নাই। উপযুক্ত গুরুর অভাবে তাহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

তার পর কোমল কণ্ঠস্বর আরও মধুর করিয়া সে বলিল, "আপনি আমায় এ বিদ্যা.টা ভাল করিয়া শিখাইবেন ?"

সুন্দরীর বিশাল নয়নের কাতর অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া জানকীপ্রসাদ বোধ হয় কিছু বিচলিত হইয়াছিল। আকাশে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি ঝরিতেছে, আলোকিত কক্ষমধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই। জানকীপ্রসাদ কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। এই নারী প্রাণ-পণ করিয়া তাহার কঠিন পীড়ার সময় শুশ্রূষা করিয়াছিল; রমণীকে সে শ্রদ্ধাও করে; সুতরাং তাহার এ আবেদনে, মিনতিপূর্ণ প্রার্থনায় উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন।

গায়ক কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কিন্তু স্ত্রীলোককে এ বিদ্যা দান করা নিষিদ্ধ। গুরুও আমাকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন।"

"তবে কি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না ?"

সে কাতর কণ্ঠস্বরে জানকীপ্রসাদ চঞ্চল হইল, সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আমি শিখাইব, কিন্তু একটা সর্ত্ত—প্রতিদানে আমি কিছু চাই।"

আগ্রহভরে মণিমালা বলিল, "বলুন, কি চান। আমার সঞ্চিত অর্থ সবই আপনাকে দিতে পারি। আপনি অমূল্য শাস্ত্র আমায় শিখাইবেন; দক্ষিণা আমি দিব না ?"

"আচ্ছা, সে পরে বলিব। আগে আপনাকে শিখাইয়া দেই, তার পর আমি যাহা চাহিব, দিতে হইবে। তবে আমি টাকার কাঙ্গাল নই, টাকা আমি চাহি না।"

"আপনাকে অদেয় কিছুই নাই।"

(৮)

একাগ্রতা সাধনার প্রথম সোপান। মণিমালার একাগ্রতার অভাব ছিল না। প্রকৃতি-দত্ত মধুর কণ্ঠ এবং এত দিনের সঙ্গীতশিক্ষা অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিল। জানকীপ্রসাদ যত্ন সহকারে তাহাকে রাগ-রাগিণীর ধ্যান শিখাইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রৌঢ় সাধক বুঝিতে পারিল, এই নারীর ধারণাশক্তি কি প্রখরা! স্বল্পায়াসেই সে ধ্যানের মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলে। অল্পদিনের সাধনায় রাগ-রাগিণীকে সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে ফুটাইয়া তুলে। শিষ্যার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া সে শুধু মুগ্ধ হইল না, বিস্মিতও হইল। রাগ-রাগিণী আলাপের সময় এরূপ নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং ঐকান্তিকতা, নিতান্তই দুর্লভ। সে দেখিত, গান গাহিবার সময় গায়িকার আননে একটা বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘায়ত নয়নে কি মধুর আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজে দীর্ঘকাল ধরিয়া সঙ্গীতের সাধনা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এমন একাগ্র তপস্যা সে কোনও দিন করিতে পারে নাই।

মুগ্ধ জানকীপ্রসাদ আত্মবিস্মৃত হইয়া অনেক সময় তাহাই দেখিত।

মণিমালা এক একটি করিয়া অনেকগুলি রাগ-রাগিণীর ধ্যান শিখিয়া লইল। সে সঙ্গীত-শাস্ত্রের গূঢ় মন্ত্রটির সন্ধান পাইয়াছিল। গুরুর চেষ্টায় সে ঈপ্সিত সঙ্গীত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছে, এখন আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! এত দিন সে সঙ্গীত-রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেখানে লতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন পাহাড়-পর্ব্বতের বিচিত্র শোভা ছিল বটে, পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, অযত্ন-বর্দ্ধিত বিশাল মহীরুহ এবং অপর্য্যাপ্ত সুগন্ধী আরণ্য কুসুমেরও অসদ্ভাব ছিল না। মন সে দৃশ্যদর্শনে মুগ্ধ হয়, অভিভূত হয়, ইহাও সত্য; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে, সীমান্ত-রাজ্য ছাড়াইয়া সে যেখানে আসিয়াছে, সেখানে মাঠের পর মাঠ শ্যামল শস্যসম্ভার বুকে ধরিয়া দিগন্তে মিশিতেছে। পুণ্যতোয়া নদীর পবিত্র সলিলধারা দুই কূল প্লাবিত করিয়া কলোচ্ছ্বাসে অনন্তের সহিত মিশিতে ছুটিয়াছে। সযত্ন-কর্ষিত ক্ষেত্রে ফলভারাবনত দ্রাক্ষা-কুঞ্জ; গাছে গাছে ফুলের কি বিচিত্র শোভা. স্নিগ্ধ বাতাসে কি মধুর গন্ধ! জনপদ-বধূর কজ্জলাঙ্কিত লোচনে কি মধুর দৃষ্টি, কুটীরে কুটীরে কি মধুর স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিরাজিত! শিশুর কম হাস্যে এখানকার অঙ্গন মুখরিত, মাতার স্নেহে গৃহের বায়ুও পবিত্র। এমন মধুর, শৃঙ্খলারচিত রাজ্য এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? আজ তাহার জীবন সার্থক! তাহার নারীজন্ম নানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও কি শান্তির আলোকে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে না?

জানকীপ্রসাদ বলিল, "তোমার শিক্ষা সমাপ্ত। আমার যাহা কিছু ছিল, সবই দিয়াছি, আর কিছু নাই।"

তিন বৎসরের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের সমুদয় সাধনলব্ধ বিদ্যা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে? অসম্ভব, নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

জানকীপ্রসাদ বলিল, "মণিমালা"—এখন সে শিষ্যার নাম ধরিয়াই ডাকিত। "আমি সত্য বলিতেছি, আমার আর বিদ্যা নাই। এখন আমার দক্ষিণা?"

দক্ষিণা? মন্ত্রগুরু কি চাহে, তাহা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছিল। কিন্তু—

"একটা কথা আছে! আমার শিক্ষা সার্থক হইল কি না, তাহার একটা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তার পর আমার প্রতিশ্রুতি-পালনের পালা।"

"সে কথা মন্দ নয়। আমি অপেক্ষা করিতে অসম্মত নই। কি ভাবে পরীক্ষা দিতে চাও, বল।"

মণিমালা নতনেত্রে বলিল, "কোন বিশিষ্ট মহফিলে প্রসিদ্ধ গায়কগণের কাছে যদি একবার গানের মজুরা হয়!"

জানকীপ্রসাদ নীরবে কি ভাবিল, তার পর সহসা বলিয়া উঠিল, "হয়েছে।—র মহারাজের ছেলের বিবাহ উপলক্ষে সেখানে একটা বিরাট্ গানের মজলিস হইবে।

দেশ-বিদেশের বহু ওস্তাদ সেখানে আসিবেন। মহারাজের ওখানে আমার গুরুদেবই প্রধান গায়ক। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সাবধান, আমি তোমাকে গান শিখাইয়াছি, এ কথা প্রকাশ পাইলে গায়ক-সমাজে আমার মুখ দেখান কঠিন হইবে।”

(৯)

বিস্তৃত প্রাঙ্গণতল বহুমূল্য গালিচা দ্বারা আবৃত। দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বেও সৌদামিনীর আলোকদীপ্তি পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিদ্যমান। এখন আর আলো জ্বালিবার জন্য সহস্র-ডালের ঝাড়ের প্রয়োজন হয় না। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ সভাপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। বহুদেশাগত গায়কগণ আজ তিন দিন ধরিয়া সঙ্গীত-বিদ্যার পরিচয় দিতেছিলেন। মহারাজ স্বয়ং সঙ্গীতানুরাগী।

আলোকোজ্জ্বল সভাক্ষেত্রে মহারাজ প্রবেশ করিয়া আসনগ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে জনৈক পদস্থ রাজকর্ম্মচারী উঠিয়া বলিলেন যে, আজিকার সভায় একটি বাঙ্গালী গায়িকার সঙ্গীতালাপ হইবে। পরম্পরায় তিনি শুনিয়াছেন, এই অজ্ঞাতনাম্নী গায়িকা সঙ্গীতের সাধনা করিয়াছে। সুতরাং মহারাজের অনুরোধ যে, আজ যেন সকলেই এই ভিন্নদেশবাসিনী গায়িকার সঙ্গীতালাপ শ্রবণ করেন।

সভাতল হইতে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। দেশপ্রসিদ্ধ গায়কগণ যেখানে সমবেত, সারাজীবনের সাধনা দ্বারা যাঁহারা সঙ্গীত-শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিয়াছেন, একটা বাঙ্গালী গায়িকা সেই সভায় গান গাহিবার স্পর্দ্ধা রাখে? ব্যাপারটা দেখিবার যোগ্য বটে। অনধিকারিণীর ধৃষ্টতা কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

অদূরে একটা নীল যবনিকা দুলিতেছিল। মহারাজের ইঙ্গিতমাত্রেই যবনিকার অন্তরাল হইতে একটি নারীমূর্ত্তি বাহিরে আসিল। বসন ও অলঙ্কারের বাহুল্য তাহার শরীরে ছিল না। পরিধানে একখানি সাদা সিল্কের সাড়ী। উভয় কর্ণে দুইটি হীরক-দুল। করপ্রকোষ্ঠে স্বর্ণচূড়, মস্তকে সূক্ষ্ম ওড়না।

মন্থরপদে রমণী সভাতলে আসিয়া দাঁড়াইল। আভূমি নত হইয়া মহারাজকে অভিবাদনের পর সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে সে নমস্কার জানাইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মৃদুগুঞ্জন তখন থামিয়া গিয়াছিল।

এক ব্যক্তি একটি সেতার আনিয়া তাহার কাছে রাখিয়া গেল। প্রয়োজনমত রাজসভার বেতনভুক্ বাদকগণ গায়িকার গানের সহিত সঙ্গত করিবে, মহারাজ পূর্ব্বেই তাহার আদেশ দিয়াছিলেন।

মহারাজের ইঙ্গিতক্রমে গায়িকা সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইল। গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে একবার কাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। ইতিপূর্ব্বে সে কতবার কত মজলিসে

গান গাহিয়াছে, রঙ্গালয়ে কতদিন অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এমন সভায় সঙ্গীতালাপ করিবার সৌভাগ্য তাহার কখনও হয় নাই। এতদিনের সাধনার ফলাফল আজ সে বুঝিতে পারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে ভীষণ দুশ্চিন্তা এবং শরীরে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। কুণ্ঠাকে জয় করিলেও তাহার হৃদয়ে কিয়ৎকাল দ্রুত রক্ত-চলাচলের কাজ চলিয়াছিল। নিমীলিতনেত্রে সে আরাধ্যা দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করিল। দেবীর বীণার চিত্র তাহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল।

সুরের সঙ্গে সঙ্গে সে গান আরম্ভ করিল। রাগিণী নহে, একটা কঠিন রাগের আলাপ সে আজ করিবে। ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠ অমৃতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোনও দিকে সে চাহিল না। শত শত শ্রোতা যে তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট, ক্রমে তাহা সে বিস্মৃত হইল। ইষ্টদেবীর সম্মুখে বসিয়া সে রাগের ধ্যানে সমাহিত, এমনই একটা অবস্থা তাহার উপস্থিত হইল। সুরের ছন্দে ছন্দে, গমকে মূর্চ্ছনায় রাগের মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে যেন দেখিতে পাইল, নীলবসনধারী, যষ্টিহস্ত, সদা রহস্যপরায়ণ এক দেবমূর্ত্তি তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ললিত-নৃত্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্রোতৃবর্গের মনে হইতে লাগিল, সঙ্গীতের আরোহণ-অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে কাহার লঘুপদধ্বনি যেন শুনা যাইতেছে, সভাতলে কাহার শব্দময়ী মূর্ত্তি যেন আবির্ভূত হইয়াছে। নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেরই দেহে পুলক-সঞ্চার হইল। বিস্ময়ানন্দে তাহারা এই গায়িকার সঙ্গীতালাপ শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইয়া পড়িল।

দীর্ঘকাল আলাপের পর গায়িকা নিস্তব্ধ হইল। বায়ু-সাগরে সঙ্গীতের শেষ তান মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কে যেন সঞ্চরণমান বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সভাতল হইতে বিদায় লইতেছে।

মহারাজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশংসমান দৃষ্টিতে গায়িকার দিকে চাহিয়া মহারাজ গলদেশ-বিলম্বিত বহুমূল্য হীরক-হার উন্মোচন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তার পর উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "বাইজি, আমি অনেক উৎকৃষ্ট গান শুনিয়াছি, কিন্তু কোনও নারী, বিশেষতঃ বাঙ্গালিনী যে মালকোশের মত কঠিন রাগকে এমন মূর্ত্তিমান্ করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। এই সামান্য উপহার শ্রদ্ধাভরে তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে।"

আনন্দ-উৎফুল্ল, কৃতজ্ঞহৃদয়ে মণিমালা মহারাজের দান মাথায় রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আজ তাহার ব্যর্থ জীবন যথার্থই সার্থক হইয়াছে। আজ সে যাহা পাইল, এ জীবনে ধ্রুব-তারার মত তাহা তাহার অবশিষ্ট জীবনকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। রুদ্ধ দরজা আজ তাহার গতিরোধ করিতেছে না। জীবনের অবলম্বনকে সে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আজ যথার্থই অনুভব করিতে পারিয়াছে।

প্রসিদ্ধ গায়ক, বৃদ্ধ মহম্মদ খাঁ মণিমালার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মায়ি,

তোমার গান শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তোমার সঙ্গীতের সাধন। সার্থক হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ বেইমান্ তোমাকে এ সকল রাগ-রাগিণী শিখাইয়াছে?”

নতনেত্রে অনুরূপ মৃদুস্বরে রমণী বলিল, “নাম বলিতে নিষেধ আছে ওস্তাদজী? আমাকে ক্ষমা করিবেন।”

বৃদ্ধ বলিলেন, “তুমি না বলিলেও আমি বুঝিয়াছি। এ রাগ আমি আমার একজন-মাত্র শিষ্যকে এই ভাবে শিখাইয়াছিলাম। কিন্তু সেও এমন করিয়া রাগকে মূর্ত্তি দিতে পারে নাই, তোমার সাধনা তাহার অপেক্ষাও প্রগাঢ়। বুড়ার একটা কথা মনে রাখিও মা। সাধারণ পুরস্কারের লোভে কোনও সাধক কোনও নারীকে এ সকল রাগ-রাগিণী শিখাইবে না। যাহা হউক, সাবধানে থাকিও, ঘোর সংযমী না হইলে তোমার তপস্যার ফল সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে।”

মণিমালা সবিস্ময় নেত্রে বৃদ্ধের প্রত্যাবর্ত্তনশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিল।

* * * * *

“আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার, মণিমালা?”

রমণী শিহরিয়া উঠিল। তার পর বলিল, “গুরুদক্ষিণা? বলুন, কি চাই?”

“সংসারে আমিও একা, তুমিও সঙ্গিহীনা। দুজনে অবশিষ্ট জীবন একত্র থাকিয়া গান গাহিয়া কাটাইয়া দিব। বুঝিলে মণি?”

“গুরুদেব, আপনি ভুলিবেন না। আমাদের গুরুশিষ্য ছাড়া অন্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। এ পথে যে সাধনা করিবে, সংযম—কঠোর সংযমই তাহার একমাত্র অবলম্বন। আজ নিজের দেওয়া শিক্ষা ভুলিতেছেন কেন?”

জান্‌কীপ্রসাদ অধীরভাবে বলিল, “আমি তোমাকে পাইব, শুধু এই আশ্বাসেই যে, গুরুর আদেশও লঙ্ঘন করিয়াছিলাম!”

“ভুলিয়া যান, গুরুজী, দুঃস্বপ্নের কথা আজ মনে করিবেন না। আমার পথ তিনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাকে সে পথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিবেন না। তবে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে, এই লউন।”

এই বলিয়া সে মহারাজ-প্রদত্ত বহুমূল্য হার জান্‌কীপ্রসাদের চরণতলে রাখিয়া দিল।

রূঢ়ভাবে হীরকহার গৃহকোণে নিক্ষেপ করিয়া জান্‌কীপ্রসাদ বলিল, “তোমার দক্ষিণা তোমারই থাক্। নারী—চিরকালই নারী—আজ তাহা বুঝিলাম।” এই বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেল।

মণিমালা নিমীলিত-নেত্রে তখন কাহার ধ্যান করিতেছিল? জীবন নাট্যের কোন্ অঙ্ক এখন অভিনীত হইবে?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ঠাকুর হরিদাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ঠাকুর হরিদাস পুনরপি কহিতে লাগিলেন—"মুক্তিলাভ হরি-নাম গ্রহণের চরম ফল নহে। মুক্তিলাভ শুদ্ধ নামাভাস হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্তস্থল অজামিলের উদ্ধার। অজামিল নারায়ণপরায়ণ ছিলেন না। নারায়ণ-নামে তাঁহার শ্রদ্ধা-বুদ্ধিও ছিল না। কিন্তু আসন্ন-মৃত্যুর ভয়ে তিনি যে তাঁহার পুত্রের নাম ধরিয়া 'বাবা নারায়ণ', 'বাবা নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হরিনামে মুক্তি লাভ করা একটা বেশী কথা নয়। অপিচ, হরিনাম গ্রহণের ফলে জীব পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ পরা ভক্তি-লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। পাপনাশ কি মুক্তিলাভ নাম গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ভক্ত যখন একবার শুদ্ধ-ভক্তিরসের আস্বাদন পান, হৃদয়ে যখন প্রেম জন্মে, তখন তাহার তুলনায় মুক্তি অতি তুচ্ছ ফল বলিয়া বিবেচিত হয়। যিনি ভক্তিধন লাভ করিয়াছেন, তিনি মুক্তি (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) চাহেন না।"

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়,
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্র মুক্তি হয়।
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়,
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়।
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপনাশ,
তাঁহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত হরিদাস ঠাকুর ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিকৃত একটি সুমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পণ্ডিতগণকে বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনারাই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য
তরণিরিব তিমিরজলধে-
র্জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম।"

অর্থাৎ অন্ধকার সমুদ্রে সূর্য্যের ন্যায়, উদয়োন্মুখ অবস্থাতেই সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার পাপান্ধকারহারী জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দের সহিত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। পরে ঠাকুর হরিদাসের মুখে উহার ব্যাখ্যান শুনিবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয়ের সহিত পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন—

"সম্যক্‌রূপে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই অন্ধকার তিরোহিত হয়। অর্থাৎ অন্ধকার-বিনাশ হইবার জন্য আর সম্যক্‌রূপে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা থাকে না। আবার চোর, প্রেত ও রাক্ষসাদির ভয়ও সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই দূরীভূত হয়। অর্থাৎ উহাদিগ হইতে আর কোনওরূপ অনর্থের আশঙ্কা থাকে না। সম্পূর্ণরূপে সূর্য্য সমুদিত হইলে জীব তখন ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ দেখিয়া সুখী হয়।"

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমোক্ষয়,
চোর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ;
উদয় হৈলে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মঙ্গল প্রকাশ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিনাম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। সূর্য্যোদয়ারম্ভে তমোবিনাশের ন্যায়, চিত্তমধ্যে নামের উদয় হইতে না হইতেই পাপান্ধকার দূরে পলায়ন করে এবং কোনও ভয় বা অনর্থের আশঙ্কা থাকে না। অর্থাৎ নামাভাসেই পাপ-তাপ দূর হইয়া অনর্থের নিবৃত্তি হয়—মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু যখন সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম সমুদিত হয়েন অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন পরম মঙ্গল পদ কৃষ্ণপদে 'প্রেম' জন্মিয়া থাকে।"

"তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়,
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুরের ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতগণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু হরিনদীগ্রাম-নিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় হিরণ্যগোবর্দ্ধনের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত, উৎকট তার্কিক। এজন্য বলরাম আচার্য্য তাঁহার 'ঘট-পটিয়া' আখ্যা দিয়াছিলেন। পণ্ডিতের তর্কশুষ্ক প্রাণে ভক্তির মহিমা ও নাম-মাহাত্ম্য স্থান পাইল না। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া ঠাকুর হরিদাসের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

"সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ! এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুনিলেন ত? বলে কি না, নামাভাসেই মুক্তিলাভ হয়! কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, নামাভাসেই তাহা লব্ধ হয়? কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা!" ব্রাহ্মণ ঠাকুর হরিদাসের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ওহে বাপু! যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি গোপাল শর্ম্মা তোমার নাকটি কাটিয়া ছাড়িয়া দিব।"

"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ,
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান।
পরম সুন্দর পণ্ডিত নবীন যৌবন,
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হয় সহন।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন,
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়,
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়।
বিপ্র কহে নামাভাসে মুক্তি যদি নয়,
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

ব্রাহ্মণের মুখে এই প্রকার অসঙ্গত কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতগণ ও হিরণ্যগোবর্দ্ধন দুই সহোদর হাহাকার করিতে লাগিলেন।

"শুনি সব সভা উঠি করে হাহাকার,
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার।
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন—
ঘটপটিয়া মূর্খ তুই, ভক্তি কাঁহা জান।
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান,
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

সভাশুদ্ধ লোক ঠাকুর হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"আপনাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই। এই ব্রাহ্মণেরও কোনও দোষ আমি দেখিতেছি না। ইঁহার তর্কনিষ্ঠ মন। তাই ইনি ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। আপনারা আমার সম্বন্ধে মনে কিছু দুঃখ রাখিবেন না। এক্ষণে সকলে গৃহে গমন করুন। কৃষ্ণ আপনাদিগের মঙ্গল করুন।"

"সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে,
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে—
তোমা সবার কি দোষ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন।
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব,
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব?
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার,
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার।"
(শ্রী চৈঃ চঃ)

উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের সহিত গোপাল চক্রবর্ত্তীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা আরও একটু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

গোপাল চক্রবর্ত্তী বলিলেন—
"ওহে হরিদাস! এ কি ব্যাভার তোমার,
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার?
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়,
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে।"

"হরিদাস বলেন—ইহার যত তত্ত্ব,
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য।
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি,
বলিতে কি বলিলাঙ যেবা কিছু জানি।
উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়,
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।"

"বিপ্র বলে—উচ্চ নাম করিলে উচ্চার,
শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার?"

"হরিদাস বলেন—শুনহ মহাশয়,
যে তত্ত্ব ইহার বেদ ভাগবতে কয়।

পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে,
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে,
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে,
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব-শাস্ত্রে বলে।"

"সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন,
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন—
দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস!
কালে কালে বেদ-পথ হয় দেখি নাশ।
যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে,
এখনই দেখি তাহা শেষে আর কেনে?
যে ব্যখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে,
তবে তোর নাক কান কাটি তোর আগে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

মহতের লঙ্ঘনের যে ফল, এ ক্ষেত্রেও তাহা ফলিল। সত্য বটে, যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি কখনও নিজের প্রতি অপরাধকারীর অপরাধ গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত-নিন্দা সহিতে পারেন না। কিসে কি হয়, তাহা আমরা জানি না এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যাহা জানি, মূঢ়তা বশতঃ দু'দিন পরে তাহাও মানি না। অভিমান-উষ্ণ অন্তঃকরণে "ধর্ম্মের কাহিনী" দাঁড়ায় না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সেই দিনই গোপাল চক্রবর্ত্তীকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। গোপালের আর যে দুর্দ্দশা হইল, তাহা শুনিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

"তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল,
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল।
চম্পক-কলিকা সম হস্তপদাঙ্গুলী
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি।
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল,
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে,
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সাক্ষাৎ দয়ার বিগ্রহস্বরূপ ঠাকুর হরিদাস বলরাম আচার্য্যের মুখে ব্রাহ্মণের উক্ত-রূপ শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ ঠাকুর ব্রাহ্মণের দুঃখে প্রাণে এতই ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, সেই দিনই তিনি চাঁদপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

"বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা,
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

এই চাঁদপুর গ্রামে ঠাকুর হরিদাস পরবর্ত্তী কোনও সময়ে আরও একবার আসিয়াছিলেন। তখন গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস অল্পবয়স্ক বালক। রঘুনাথ বলরাম আচার্য্যের নিকট যাইয়া প্রতিদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। এমন সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন প্রখর-মেধাশালী বালক আচার্য্যের টোলে ইতিপূর্ব্বে আসে নাই। এত বড় বাপের বেটা, কিন্তু বালকের চরিত্রে অভিমানের গন্ধমাত্র ছিল না। ঠাকুর হরিদাসের ভজনে আকৃষ্ট হইয়া রঘুনাথ একদিবস তাঁহার কুটীরের দ্বারে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীত-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন বিষয়-বিরাগী ত্যাগী পুরুষ হরিদাস ঠাকুর কিন্তু সেই দিন হইতে বালকটিকে একান্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। বালকটিও ভক্তির আকর্ষণে পড়িয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঠাকুরের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিত না। এই বালকই উত্তরকালে বৈরাগীর শিরোমণি রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

"রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন,
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরে

যে সময়ের প্রসঙ্গ হইতেছে, তৎকালে শান্তিপুরের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত লাউড় নামক এক গণ্ডগ্রামে ১৩৫৫ শকে শুভ মাঘী সপ্তমী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। * পিতার নাম কুবের আচার্য্য ও মাতার নাম লাভা দেবী। কুবের আচার্য্য পরিণত-বয়সে শ্রীহট্ট হইতে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া সপরিবারে বসবাস করেন। নবদ্বীপেও তাঁহার একটি বাস-ভবন ছিল। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র তাঁহার প্রথম যৌবনে একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল কমলাক্ষ আচার্য্য, উপাধি ছিল বেদ-পঞ্চানন। পরে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন, ভক্তিশাস্ত্রেও তাঁহার তদ্রূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অসাধারণ অধিকার ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, আচার্য্য জ্ঞানের হিমালয় ও ভক্তির প্রশান্ত মহাসাগর ছিলেন। তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির নিকট দীক্ষিত হইবার পর হইতে কখনও নবদ্বীপে এবং কখনও শান্তিপুরে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্মাচরণ ও ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যান দ্বারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এই উভয় স্থানেই তাঁহার টোল ছিল।

তৎকালে দেশমধ্যে ধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। লোক সকল কৃষ্ণ-ভক্তিহীন ও একান্ত বহির্ম্মুখী। সমাজ নীরস, শুষ্ক—মরুভূমিতুল্য। আচার্য্য যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই দেখেন—কেবল পাপ, তাপ, জ্বালা। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, দম্ভ ও অভিমান লইয়া লোকেরা সতত উন্মত্ত। তাহারা সুখের লাগিয়া সকল করিতেছে, কিন্তু প্রাণে সুখ পাইতেছে না। নরনারী শান্তিহারা। সমস্ত সংসার যেন ধক্ ধক্ করিয়া

---

* শ্রীগৌরাঙ্গকে সূতিকা-গৃহে দেখিতে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছিলেন,—

> "অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল,
> তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল।"
>
> (শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে। তখন শ্রীঅদ্বৈতের বয়স ৫২ বৎসর। সুতরাং অদ্বৈত প্রভুর জন্মসন ১৩৫৫ শক।

জ্বলিতেছে। যাহাতে ভব-রোগ দূর হয়, যাহাতে হৃদয়ের তাপ যায়, যাহাতে প্রাণ শীতল হয়, সেই পরম বস্তু—সেই বিষ্ণুভক্তি বিস্মৃত হইয়া জীব ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। ইহা দেখিয়া সেই মহান্ বিশ্বপ্রেমিক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জীবের দুঃখ দিবানিশি তাঁহাকে বিহ্বল করিতে লাগিল। জীবের দুঃখ-তাপ দূর করিতে হইবে, ভক্তির অমৃত-সেকে জীবের প্রাণ শীতল করিতে হইবে, কৃষ্ণপ্রেমে সকলকে কাঁদাইতে হইবে, ইহাই প্রভু অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা। এই উদ্দেশ্যে আচার্য্য আপাততঃ কখনও নবদ্বীপে, আর কখনও বা শান্তিপুরে থাকিয়া ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন, আর কাতরপ্রাণে অনুক্ষণ 'হা গোবিন্দ', 'হা গোবিন্দ' বলিয়া ভক্তিদাতা ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুরে আসিলেন। অদ্বৈতপ্রভু তখন শান্তিপুরের বাটীতেই ছিলেন। হরিদাস প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আচার্য্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র চিনিলেন—ইনি হরিদাস ঠাকুর। হরিদাসকে দেখিয়া তাঁহার সুখের সাগরে তরঙ্গ উঠিল, কিন্তু তথাপি একটু ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন?"

হরিদাস ঠাকুর বিনয় বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—

"প্রভো! আমি ক্ষুদ্র জীব; জাতিতে অধম ম্লেচ্ছ। আপনকার শ্রীচরণ-দর্শনমানসেই এ স্থানে আসিয়াছি।"

> "ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম,
> আসিয়াছোঁ তুয়া পদ করিতে দর্শন।"
>
> (শ্রীঅঃ প্রঃ)

হরিদাসের এই প্রকার দৈন্যোক্তি শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন,—

"মহাশয়! কে ছোট, কে বড়, কে কোন্ জাতি, তাহা আমি সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম। আমার মতে যাঁহার আচরণ সাধু, তিনিই শ্রেষ্ঠ; আর, যিনি বিষ্ণুভক্ত, তিনিই দ্বিজ।"

> "কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি,
> সাধু আচরণ যাঁর তাঁরে শ্রেষ্ঠ মানি।
> অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়,
> সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাদেশ হয়।"
>
> (শ্রীঅঃ প্রঃ)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস এত দিন দূরে দূরে থাকিয়াও, পরস্পরকে ভাল-রূপে জানিয়াছিলেন; দু'য়ের মধ্যে বিনা পরিচয়েও বিশিষ্ট পরিচয় হইয়াছিল। এক্ষণে উভয়ের সাক্ষাদ্দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল; পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রেমজলে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তির দুইটি প্রবল প্রবাহ একত্র সম্মিলিত হইয়া, উত্তরকালে কৃষ্ণভক্তির বন্যায় দেশ ভাসাইবে বলিয়াই যেন কিছু কালের জন্য একস্থানে থাকিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

আচার্য্য গঙ্গার তীরে অতি নির্জ্জন প্রদেশে হরিদাস ঠাকুরের ভজনের নিমিত্ত একটি গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঠাকুর সেই গোফামধ্যে থাকিয়া পরম সুখে আপনার প্রিয় ব্রত অর্থাৎ দিবারাত্রে তিন লক্ষ হরিনাম-জপ-রূপ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগি-লেন। ভিক্ষার অনুরোধে তিনি দিনের মধ্যে একবার অদ্বৈত-গৃহে গমন করিতেন। তদুপলক্ষে অদ্বৈত প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া গোফায় ফিরিয়া আসিতেন।

"গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জন তাঁরে দিলা,
ভাগবত গীতার অর্থ তাঁরে শুনাইলা।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ,
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

উল্লিখিত গোফা আর আর কিছুই নহে, মাটীর একটি গর্ত্তবিশেষ। গঙ্গার উচ্চ পাড়ে বহির্দ্দেশ হইতে খনন করিয়া একটি কোঠার ন্যায় করা। উহার একটী মাত্র দরজা— গঙ্গার দিকে। গোফার ভিতর ও সম্মুখভাগ গোময় দ্বারা লেপিত। দরজার এক পার্শ্বে গোময়-লেপিত বেদীর মধ্যস্থলে এক ঝাড় কৃষ্ণতুলসী। ঘরে বসিয়াই গঙ্গা-দর্শন হয়। ভজনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মনোরম স্থান আর কি হইতে পারে?

এমন নির্জ্জন পবিত্র স্থান পাইয়া ঠাকুর হরিদাস মনের সুখে ভজন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু যে স্থানে এক ফোঁটা মধু, সেই স্থানেই পিপীলিকার জাঙ্গাল! ইহা অনি-বার্য্য। হরিদাস ঠাকুরের স্থানে একটি দুইটি করিয়া ক্রমে বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইলেন।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণলাভের কামনায় গয়ার অরণ্য-প্রদেশে বোধি-দ্রুমতলে পদ্মাসনে বসিয়া মহাসাধনায় নিমগ্ন, তৎকালে বারংবার মার আসিয়া নানা প্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিল। ভক্তির মহা সাধক ঠাকুর হরিদাসের জীবনেও বারংবার লৌকিক ও অলৌকিক পরীক্ষা আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের পাদপদ্মে যাঁহার চিত্ত-ভৃঙ্গ নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে কোনও প্রকারের বিভীষিকা-প্রলোভন দেখাইয়া বিচলিত করিতে পারে, এমত সাধ্য কার? বেণাপোলের ন্যায় এই শান্তিপুরের আশ্রমেও হরিদাস ঠাকুর এক পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এবারে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন স্বয়ং মায়া। ঘটনা অলৌকিক, কিন্তু তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে? এমন বহু ব্যাপার আছে, যাহা আমাদিগের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর।

হরিদাস ঠাকুর গোফাতে বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি। দশদিক্ সুনির্ম্মল। সম্মুখে জাহ্নবী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছেন। গোফার সম্মুখে গোময়-সুলেপিত পিণ্ডার উপরে তুলসী-মহারাণী গায়ে জ্যোৎস্না মাখাইয়া হাসিতেছেন। সুন্দর ঠাকুর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে গগনে পবনে হরিনামের মধু ছড়াইতেছেন। দেশ, কাল, পাত্র সকলই মধুর, সকলই মনোরম। এহেন কালে অঙ্গের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিয়া কণকণিতাভরণা কনক-বরণা এক কামিনী আসিয়া তুলসী-প্রণাম ও তুলসী-পরিক্রমা পূর্ব্বক সহসা ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল,
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল।
দ্বারে তুলসী লেপা-পিণ্ডার উপর,
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর।
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা,
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা।
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত,
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার,
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই অলোকসামান্যা নারী হরিদাস ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া মৃদু-মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি জগতের বন্দনীয়। তুমি রূপবান্, গুণবান্। তুমি সাধু। দীন জনে দয়া করাই সাধুর স্বভাব। আমি তোমার কৃপার ভিখারী, আমাকে অঙ্গীকার কর।"

"মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়,
দীনে দয়া করে এই সাধু-স্বভাব হয়।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

নিরন্তর কৃষ্ণনামে আবিষ্টচিত্ত, নির্ব্বিকার, গম্ভীরাশয় ঠাকুর হরিদাস রমণীকে কহিলেন—

"দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন,
নাম-সমাপ্ত্যে করিব তোমার প্রীতি-আচরণ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই বেণাপোলের জঙ্গলে যেমন-যেমন হইয়াছিল, এই পতিতপাবনী সুরধুনীর তট-ভূমিতেও আবার তিন রাত্রি ব্যাপিয়া যেন তাহারই পুনরভিনয় হইয়া গেল। তৃতীয় রাত্রির অবসান-কালে—

"তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার,
আমি মায়া, করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।
ব্রহ্মাদি জীব মুঞি সবারে মোহিল,
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।
মহা ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে,
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম-শ্রবণে
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে,
কৃষ্ণ-নাম উপদেশি কৃপা কর মোতে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস কহিলেন—

"দেবি! আপনার চরণে নমস্কার। আমি অধম, ক্ষুদ্র কীট। আমার উপর এই পরীক্ষা! কিন্তু আমার মনে বড়ই কুতূহল হইতেছে,—আপনি কি নিমিত্ত কৃষ্ণনামের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন?"

মায়া বলিলেন—

"পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে,
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।
মুক্তি হেতু তারক হয়েন রামনাম,
কৃষ্ণনাম পারক, করেন প্রেম দান।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস পুনরায় হরিনামকীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইলেন। মায়া ভক্তের মুখ-নিঃসৃত সেই নাম হৃদয়ে রোপণ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে লোকসমাগমও বাড়িয়া চলিল। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুর হরিদাসকে এত আদর, যত্ন ও সম্মান করিতে লাগিলেন যে, নিষ্কিঞ্চন হরিদাস ঠাকুর তাহাতে নিতান্তই কুণ্ঠিত হইলেন এবং এক দিন আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কাছে আপনার মনের কথা অকপটে বলিয়া ফেলিলেন।

"হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দাও কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ,
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়,
সেই কৃপা করিবা যাতে মোর রক্ষা হয়।
আচার্য্য কহেন—তুমি না করহ ভয়,
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন,
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুর মহা বিপদে পড়িলেন। যিনি অপরকে মান দিবার জন্যই সতত সচেষ্ট, যিনি আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ দীনাতিদীন মনে করেন, এমন যে নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঠাকুর হরিদাস, তিনি কি শ্রীঅদ্বৈতের এত মান-মর্য্যাদা সহ্য করিতে পারেন? ভাবিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্রান্ন ভোজন? বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। হরিদাস মনে মনে বলিলেন—'না, আর নয়।' প্রকাশ্যে অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—

"অহে প্রভু আজ্ঞা দেহ যাও বিরলেতে,
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে।"

প্রভু কহে, "তো বিচ্ছেদে মোর প্রাণ ফাটে,
নিষেধিতে না পারি ভজনের বিঘ্ন ঘটে।"

হরিদাস প্রভুপদে দণ্ডবৎ কৈলা,
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে গাঢ় আলিঙ্গিলা।

হরিদাস কহে, "মুঞি অস্পৃশ্য পামর,
মোর অঙ্গ ছুঁই কেন অপরাধী কর ?"
প্রভু কহে, "নাহি বুঝি সজাতি দুর্জ্জাতি,
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি।"
হরিদাস কহে, "প্রভু, সকলি সম্ভবে,
তুয়া সুনির্ম্মল কৃপা যদি হয় জীবে।"
এত কহি করযোড়ে প্রভু আজ্ঞা লঞা,
ফুলিয়া গ্রামেতে গেলা হরি সঙরিয়া।"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

শান্তিপুরের উপকণ্ঠে * "বাবলা" নামক স্থানে ঠিক গঙ্গার উপর অদ্বৈত প্রভুর একটি নির্জ্জন ভজন-স্থান ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই সেই স্থানে আপন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। মাঝে মাঝে আসিয়া পড়ুয়াদিগকে পাঠ দিয়া যাইতেন। হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুর পরিত্যাগ করিলে পর অদ্বৈতাচার্য্য বাবলায় চলিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি সুরধুনীর তীরে সেই বাবলায় বসিয়া করপুটে গঙ্গাজলতুলসী লইয়া "হা কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ না হইলে ধর্ম্মের গ্লানি কে দূর করিবে? জগতে ভক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে তিনি ভিন্ন আর কে পারে? সেই গোলোকবিহারী ভূভারহারী শ্রীহরিকে ধরাধামে আনিতেই হইবে, প্রাণে এই আশা, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া অদ্বৈত সিংহ রোমাঞ্চিত-কলেবরে শ্রীগোবিন্দের নামে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর এক্ষণে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই ফুলিয়া গ্রাম বাবলা হইতে অল্প ব্যবধান মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

---

* শ্রীঅদ্বৈতের সেই ভজন-স্থান "বাবলা-পাট" নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর সপ্তম দোলের দিন সেখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষিত-সমাজের বহু ভক্ত-সজ্জন সে স্থানে যাইয়া কীর্ত্তনোৎসব করিয়া থাকেন। সেই প্রাচীন স্থান আর সেই প্রাচীন গঙ্গার খাত অদ্যাবধি বর্ত্তমান। অতি মনোরম স্থান। স্থানের অসাধারণ প্রভাব অদ্যাবধি অনুভূত হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রীসীতানাথের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরটির অবস্থা শোচনীয়। সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। তাহার একাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। যাঁহার হুঙ্কারে শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেই সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতের এই আদি ভজন-স্থলীর প্রতি বৈষ্ণব-সাধারণের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সমালোচনা

"ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।"—মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গত হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির আসন হইতে যে অনন্যসাধারণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা একাধিক কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। আবার সেই স্পর্দ্ধানুরূপ যোগ্যতা যাঁহারা রাখেন, তাঁহাদের সংখ্যা আরও অল্প। এই অত্যল্প গুণিগণের মধ্যে স্যার আশুতোষ এমনি একজন মানুষ, যাঁহার স্পর্দ্ধার অনুরূপ যোগ্যতা আছে এবং যোগ্যতার অনুযায়ী স্পর্দ্ধা আছে।

৺বিহারীলালের—"মা বঙ্গ-ভারতী"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে করিতে ৺হেমচন্দ্রের অতুলন দেশাত্ম-বোধের কল্পনায় পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বৈদিক যুগের বিরাট সহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া "এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গতি যে দিক",—সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া, ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও তাহার "প্রকৃত অভ্যুদয়" এবং "পূর্ণত্ব লাভের" পন্থা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সাহিত্যগুলির একসঙ্গে আলোচনা ও তাহাদের পরস্পর যোগাযোগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঐ সমস্ত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, বর্ত্তমান ইউরোপের যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই যে সহজ সাধ্য নহে, তাহা আমরা জানি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত একটি দ্বীপ নহে;—আয়র্লণ্ডের মত একটি উপদ্বীপ ত নহেই। তা ভারতবর্ষ আর আয়র্লণ্ডের সাহিত্যিক উপদ্রবের মধ্যে,—কেল্টিক অভ্যুদয় আর "বাঙ্গলার প্রাণের" দলের অভ্যুদয়ের মধ্যে, যত কেন সাদৃশ্য কল্পিত হউক না। ভারতবর্ষ,—ইতিহাস ও ভূগোলের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, ইউরোপের মতই একটি মহাদেশ। ইংরেজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতিসকলের এক একটি বিশেষ সাহিত্য আছে। তাহাদের বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি এক ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা ঐক্যও আছে। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে, এবং তাহা অতি প্রাচীন।" 'ভাষা' অর্থে এখানে অবশ্য 'সাহিত্যই' বুঝিতে হইবে।

এখন ভারতের এই প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্যগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য,—যাহা এক ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্গত বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই বর্ত্তমান, তাহাকে এই বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার আদর্শে আরও বৃদ্ধি করিয়া, পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধান করিতে হইবে। আলোচ্য অভিভাষণের ইহাই মূল ও সাধারণ বক্তব্য।

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড জাতীয়তার সৃষ্টি ও উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া যাঁহারা এতদিন মনে করিয়াছেন, এবং এখনও সময় সময় করেন, এবং প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে মুছিয়া দিয়া, অথবা বহু অংশে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা হয় ইংরেজী কিংবা হিন্দি ভাষাকে সমগ্র ভারতের সার্ব্বজনীন জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী, সেই উভয়দলের উক্তি ও যুক্তিকেই তিনি বিধিমত নিরসন করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ ভাষাগত ঐক্যের পরিবর্ত্তে ভাবগত ঐক্যের উপরেই সমধিক নির্ভর করিতে বলিয়াছেন; এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ভাবগত ঐক্য বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে,—এক জাতীয়ত্ব-বোধ সম্ভবপর হইবে না; এবং এক জাতীয়ত্ব-বোধ যেখানে সম্ভবপর নহে, সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন,—যাহা মূলে এক জাতীয়ত্ব-বোধের উপর নির্ভর করে, তাহা স্যার আশুতোষের ভাষায় বলিতে হইলে "আপাততঃ উত্তেজিকা হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি কি করিয়া যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, এক অখণ্ড ভারতের জাতীয়ত্ব-বোধের সহিত ঐক্য রাখিয়া, পরিপুষ্ট হইবে;—এক অখণ্ড ভারতের সভ্যতা ও সাধনা কি করিয়া যে প্রাদেশিক সাহিত্যের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবে, তাহার একটি কার্য্যকারী উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন যে, সমগ্র ভারতে ৭।৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইবে। "যাঁহারা এই এম, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ একটি মূল ভাষা ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। * * যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে, আমরা এমন ২।৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া, ভারতের অপর ২।৪টি ভাষাতেও সুপণ্ডিত। * * ফলে দাঁড়াইবে এই,—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, মতি-গতি, সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য, তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবে।"

প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিয়া, পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিয়া, কিরূপে সমগ্র ভারতে একটা ভাবগত ঐক্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়,—সাহিত্যে "বঙ্গালার দল" বলিয়া

যাঁহারা উপহসিত, তাঁহাদেরও ইহাই চিন্তা। স্যার আশুতোষ বলিতেছেন, "বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য। আমরা বলি যে, ইহাই আমাদেরও বক্তব্য।

বৈশিষ্ট্য মুছিয়া দিয়া যে ঐক্য, তাহা জীবিতের নহে, মৃতের। জীবনের চিহ্নই বিকাশ। বিকাশের পথেই বৈচিত্র্য। কিন্তু বৈচিত্র্য অর্থ বিচ্ছিন্নতা নহে। ক্রম-বিকাশের পথে বৈচিত্র্য যত বাড়িবে, ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে। ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। ইউরোপের দার্শনিক প্রতিনিধি জার্ম্মান দর্শনেরও তাহাই অভিমত। আর আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমরাও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গিয়া স্যার আশুতোষ প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতে এক ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টিকল্পে যে সিদ্ধান্ত সাহিত্যসেবীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি ব্যক্তিগত, কি সমাজ-জীবন সম্পর্কে অতি উচ্চ ও বর্ত্তমানে স্বীকৃত যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত, তাহার সহিত সম্পূর্ণ অনুস্যূত। কিন্তু স্যার আশুতোষের সিদ্ধান্তের ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব, অন্ততঃ একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব নহে।

বাঙ্গলা দেশে কয়েক বৎসর হইতে "বাঙ্গলার দল" বনাম "বিশ্বের দল" বলিয়া দুইটি আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী যুধ্যমান দলের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। বাঙ্গলার দল, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ সুরকে বজায় রাখিয়া ক্রম-বিকাশের বিচিত্র পথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী। পক্ষান্তরে, বিশ্বের দল, ইউরোপীয় সাহিত্যের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে ভাব ও ভঙ্গী নকল করিয়া, বহু অংশে বাঙ্গলা সাহিত্যের সুচির-কালের ঐতিহাসিক ধারা ও বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যকে, তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিতে উন্মনা। বলা বাহুল্য, বিশ্বের দলের নিকট ইউরোপীয় সাহিত্যের ইংরেজী তর্জ্জমাই বিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্বের দল স্বীকার না করিলেও, তাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ইতিমধ্যেই বহু পরিমাণে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন; এবং কালে আরও অস্পষ্টতর করিয়া তুলিবার জন্য কথাবার্ত্তায় ইঙ্গিত করিতেছেন। স্যার আশুতোষ এই তথাকথিত বিশ্বের দলকে স্পষ্টই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে—"বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্যগঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য।" সুতরাং স্যার আশুতোষ যাহাকে "বাতুলতার কার্য্য" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—আমরা বাঙ্গলার দল, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমরা বলিতে কোনরূপ বাধা বোধ করিতেছি না যে, 'বাঙ্গলার দলের' সহিত স্যার

আশুতোষের এই মনোজ্ঞ অভিভাষণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং সেই বাঙ্গলার দলের সমক্ষেও তিনি একটি অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য সত্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গলার দল বিভিন্ন জাতির,—তাহা স্বদেশীই হউক, আর বিদেশীই হউক, পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে কোন দিনই আপত্তি করে নাই, আজিও করিবে না। বাঙ্গলার দল, স্যার আশুতোষেরই সহিত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন,—"যত সঙ্কোচ, বন্ধন তত কঠোর; যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে"; এবং পরস্পর * * "আদান প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই।" কেবল বাঙ্গলার দল আশঙ্কা করেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্য 'আদান' করিতে যাইয়া যদি তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, এবং যাহা সে ইতিমধ্যেই বহু পরিমাণে ফেলিয়াছে, তবে সে 'প্রদান' করিবে কি? একটা সাহিত্যের বিচার নির্ভর করে, সে কতটা 'আদান' করিতে পারিয়াছে, তাহার উপরে নয়, পরন্তু সে কতটা 'প্রদান' করিতে পারিয়াছে, তাহারই উপরে। কাজেই আবার বলি, বৈশিষ্ট্য হারাইলে 'প্রদান' করিবে কি? আর যদি সে প্রদান করিতে না পারে, তবে বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায়? কেবলি 'আদান' করিয়া, আর একটা বিজাতীয় সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইয়া কোন্ হতভাগ্য সাহিত্য কতদিন ইতিহাসের বক্ষে তাহার অস্তিত্বের জীর্ণ ভার বহন করিতে পারে? আর তাহা পারিয়াই বা লাভ কি? সুতরাং বাঙ্গলার দল, বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পরিপন্থী, সে ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে অবিচারে 'আদান' ব্যাপার, তাহাকে অত্যন্ত উৎসাহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। আর কেবল এক ইংলণ্ডীয় বা এমন কি, ইউরোপীয় সাহিত্যকেই বাঙ্গলার দল 'বিশ্ব-সাহিত্য' বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম এবং 'তজ্জন্য সম্যক্ মনস্তাপবিশিষ্ট।'

কিন্তু বাঙ্গলার দল স্বীকার করেন, এবং মনস্বী স্যার আশুতোষের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন যে, এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বিশ্বে আপন অধিকার সাব্যস্ত করিবার যুগে,—প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং আত্ম-রক্ষাকল্পে, বিজাতীয় সাহিত্য হইতে যতটা সঙ্কোচনীতি অবলম্বন করিতে বাঙ্গলার দল সতর্ক হইতেছেন, ততটা সঙ্কোচ-নীতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিতে কিছুতেই পরামর্শ দেন না। প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে বাধা জন্মাইলে, আমরা নিশ্চিতই নিতান্ত অতর্কিতভাবে একটা সাহিত্যিক আত্মহত্যার পথে পা বাড়াইব। ঠিক এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যাহাতে পরস্পর ভাবের অবাধ বাণিজ্য (Free trade) অনায়াসে চলিতে পারে, তাহার পথ সুগম করিবার জন্য, স্যার আশুতোষ যে আদর্শ প্রকট করিয়া তদুপযোগী কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে, কে জানে, তিনি একটা আসন্ন সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না?

কে জানে, প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি তাঁহার উদ্ভাবিত পথে না চলিলে, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড জাতীয়তা-সৃষ্টির বিরোধী হইয়া, অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিবে কি না? কে জানে, একটা আসন্ন বিপদের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে, বাঙ্গলার সারস্বত মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে, একটা সাবধান বাণী, সময় বুঝিয়াই উচ্চারিত হইল কি না? স্যার আশুতোষের সমগ্র অভিভাষণের এইখানেই কৃতিত্ব। বাঙ্গালী, ইংরেজী, এমন কি, ফরাসী সাহিত্যও জানে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ এবং ফরাসীকেও জানে। কিন্তু বাঙ্গালী, মারাঠী দ্রাবিড় সাহিত্য জানে না, সেই সঙ্গে কে জানে বা বাঙ্গালী মারাঠী ও মান্দ্রাজবাসীকে জানে কি না? বর্ত্তমান ভারতে ইহার মত গুরুতর সমস্যা আর নাই। সমগ্র ভারতব্যাপী যাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে, আমাদের শ্লাঘার বিষয়, এমন একজন বাঙ্গালী, আজ এই সমস্যার মীমাংসার জন্য অগ্রসর।

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির পরস্পর ভাব-বিনিময়ের যে কার্য্যপ্রণালী, স্যার আশুতোষ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার আশঙ্কিত "কর্কশ সমালোচনা" প্রয়োগ করিব না,—করিতে পারি না। কেন না, এই কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা এত শীঘ্র হয়ত সম্ভবপর নয়। ফল দেখিয়া কার্য্যপ্রণালীর বিচার বিধেয়। স্যার আশুতোষ উদ্ভাবিত কার্য্য-প্রণালীর ফল এখনও তাঁহারই ভাষায় বলিতে গেলে—"কিছুকাল পরে, বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে" দেখা যাইবে।" সুতরাং আমরা এখনই তাহার সমালোচনা কি করিয়া করি?

ইংরেজী ভাষাকে শুধু বিজাতীয় ভাষা বলিয়াই যে স্যার আশুতোষ তাহাকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা নহে। যে কারণে ইংরেজী ভাষাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি স্বজাতীয় হিন্দি ভাষাকেও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নির্ভয়ে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যে কারণে ইংরেজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, অশ্বত্থপাদজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে,—সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-সমূহ তাহার নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।" স্যার আশুতোষের এই সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

স্যার আশুতোষ বলিয়াছেন,—"আমি সাহিত্যসেবী নহি। বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি।" কিন্তু এই নব নব উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, অক্লান্তকর্ম্মী তাঁহার দেহ ও মনের বিপুল শক্তিকে যে ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের মন্দিরে যে তাঁহার

প্রেরিত "রক্ত জবার অর্ঘ্য" আসে নাই, এ কথা সেই বলিবে—যে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলাকে জানে না। বিমাতার গৃহে নিজের মায়ের জন্য যিনি স্থান করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা মায়ের সন্তান, তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিবেন না।

"পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য।—বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ যথেচ্ছ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে। যাহা আবর্জ্জনা, তাহা আয়তনে যতই বৃহৎ হউক, সাহিত্যের গৌরব নহে,—কলঙ্ক।

প্রতিভার প্রধান কার্য্য মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা। প্রতিভা আছে, অথচ তাহার সম্মুখে কোন সৃষ্টি নাই, কিংবা সৃষ্টি আছে অথচ তাহার পশ্চাতে কোন প্রতিভা নাই, ইহা একরূপ অসম্ভব। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রতিভা ও এইরূপ সৃষ্টি, বিস্তর অনুসন্ধান করিলেও, অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। আর বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যতীত সাধারণের তাহা অপ্রাপ্য। কিন্তু নিতান্ত মোসাহেব ভিন্ন একালে কি সাহিত্যে, কি সমাজে, বিশেষ ভাগ্যবান্ই বা কে? পক্ষান্তরে, কেবল দোষদর্শী নিছক নিন্দুককেও ত এই উগ্র ও প্রচণ্ড সত্যাগ্রহের দিনে ন্যায়নিষ্ঠ সাহিত্যিক বলা যাইতে পারে না। নিন্দুকের অদৃষ্ট বড় মন্দ। সে বিশেষরূপেই ভাগ্যহীন।

স্তাবক ও নিন্দুকে মিলিয়া সম্প্রতি কিছুদিন হইতে সাহিত্যে, বিশেষভাবে সমালোচনা-বিভাগে যাহা সৃষ্ট করিতেছে, আবর্জ্জনা হিসাবে তাহা যতই বৃহৎ হউক, সাহিত্য হিসাবে তাহার মূল্য অতি অল্প। যদি বলা যায়, আবর্জ্জনায় কি 'সার' নাই? উত্তরে বলিব, অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা বৃক্ষাদির উপভোগ্য, মনুষ্যের নহে।

এই শ্রেণীর স্তাবক ও নিন্দুক আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ও যুধ্যমান। কিন্তু ইহার একে অন্যকে সম্ভব করিতেছে। মোসাহেবি চলিলে তাহার নিন্দাও চলিবে। ইহা স্বাভাবিক। কাজেই মূলতঃ ইহারা উভয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। এমন অনেক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা মোসাহেবির পক্ষ লইয়া নিন্দুকদের গালি দেন, আবার অনেকে আছেন—যাঁহারা নিন্দুকের পক্ষ হইয়া মোসাহেবির উপর খড়গ-হস্ত হয়েন। এমন ব্যক্তিদের পণ্ডিত বলিতে পারি না। যেহেতু, তাঁহারা নিন্দুক ও স্তাবকের অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখিতে পান না।

সত্য বটে, সমস্ত গরুর রং কিছু এক হইতে পারে না। সাদাও আছে, কালাও আছে। কিন্তু সমস্ত গরুর দুধের রং নিশ্চিতই সাদা। তেমনি সমস্ত সমালোচকই কিছু এক রংএর বা এক শ্রেণীর হইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত সমালোচকের বক্তব্যই

অন্ততঃ সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। নিছক নিন্দা বা নিছক চাটুবাদে যে সমালোচনা নাই, তাহা নহে, তবে তাহা সমালোচনা অপেক্ষা নিন্দা ও চাটুবাদই বেশী। আমাদের অভিপ্রায়, এই নিন্দা ও চাটুবাদ কমিয়া যাহাতে সমালোচনার অংশ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কেননা, নিন্দা ও চাটুবাদ সাহিত্য নহে, সমালোচনাই সাহিত্য।

"পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য" লইয়া সম্প্রতি একটা সমালোচনার তরঙ্গ উঠিয়াছে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাগুলি খুলিলেই, প্রতিমাসে আমরা এই বিষয়ের দুই চারিটি সমালোচনার হস্ত হইতে কোন ক্রমেই অব্যাহতি পাই না। ভারতবর্ষ,—বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যায়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, আবার আমাদিগকে এই শ্রেণীর এক সমালোচনা দ্বারা কথঞ্চিৎ বিব্রত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইতিহাসে যে সমস্ত জাতি প্রাচীনত্বের দাবী করেন, সভ্যতার উৎকর্ষ ও বিশেষত্ব হিসাবে এবং এমন কি, বয়স হিসাবেও বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদের মধ্য হইতে ত ফেলিয়া দিবার নহে। বাঙ্গলার রাজ্যসীমা একদিন কপিলবস্তু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না, আর যুবরাজ সিদ্ধার্থ বিদ্যার্থী হইয়া কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদের কোন এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া তৎকালীন (?) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা কুশাগ্র-ধী প্রত্নতত্ত্ববিদের বিস্তর গবেষণার বিষয় হউক, তথাপি দুঃসাহসিক না হইয়াও এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, 'প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের অতীতেও' বাঙ্গালীর ইতিহাস আছে, সাহিত্য আছে। বৌদ্ধযুগ কত দিন হইতে কত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় স্থায়ী হইয়াছিল, এখনও তাহা অবিসংবাদিতরূপে কোন ইতিহাসে এম, এ, স্থির করেন নাই। গৌড় একটা জাতির অতীত ইতিহাস বক্ষে লুকাইয়া ঘুমাইয়া আছে। গৌড় ত শুধু মুসলমানের ধ্বংসাবশেষ নয়। বৌদ্ধের মঠ ও হিন্দুর মন্দিরের বিলুপ্ত কাহিনীর কথাও সে বলে। তবে পাঠান ও মোগল যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যই একমাত্র 'পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য' হইবে কেন? পরে পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য কোথায়? বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে ত বাঙ্গালী বর্ব্বর ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দু-যুগের বাঙ্গালী যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিল, এ কথাও বাঙ্গলা দেশে আজ প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হইবে।

এত বড় একটা প্রাচীন জাতির কতক আবিষ্কৃত, অধিকাংশই অনাবিষ্কৃত, সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা "হেলায় লঙ্কা করেন জয়"—ভারতবর্ষের বক্ষ্যমাণ পুরাতন ও নূতন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদেরই একজন। বাঙ্গলা সাহিত্যের সমালোচনায়, তাহা পুরাতনই হউক আর নূতনই হউক, আমরা কোনক্রমেই 'হেলায় লঙ্কা জয়ের' পক্ষপাতী নহি।

যিনি অধ্যাপক, তাঁহার নিকট আমরা শিক্ষণীয় নূতন কিছু আশা করি। আমাদের

দুরদৃষ্ট, আমরা তাহা পাইলাম না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এ কালের বঙ্গ-সাহিত্যকে "চর্ব্বিত-চর্ব্বণের যুগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদেরও সেইরূপই মনে হইতেছে। কেন না, এমন কথাই তিনি বেশী বলিয়াছেন, বিশেষতঃ পুরাতন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে,—যাহা তাঁহার পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে; এবং যে কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে আমরা একাধিকবার প্রয়াস করিয়াছি। অধ্যাপক বলিতে-ছেন, পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের লক্ষণ

—ক) "একটা প্রচলিত প্রথার (Convention) চারিদিকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরা।"

আর, তাহাতে

—খ) "আধুনিক যুগের বিরাট্ প্রশ্ননিচয় ও তাহার সমাধানচেষ্টা নাই।"

অনুকরণ-যুগের বাঙ্গালী, জীবনের বৈচিত্র্য বলিতে সে কি বুঝে, তাহা অন্ততঃ সমা-লোচনা-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত বিশদ করিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আর এই জীবনের বৈচিত্র্যই নাকি এ যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, এমনও কদাচিৎ শুনা যায়। আমরা ত এই বৈচিত্র্যের অর্থ বুঝি না। বাঙ্গালীর মনে অভূতপূর্ব্ব কোন্ বৈচিত্র্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে? আমরা ত দেখি,—'আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে।'

আর দ্বিতীয় অভিযোগ যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 'আধুনিক যুগের বিরাট্ প্রশ্ননিচয় ও তাহার সমাধান-চেষ্টা করেন নাই।' আশ্চর্য্য! একজন অধ্যাপক, অন্ততঃ সাধা-রণ রকমের শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ 'সমাধান' (?) করিতে পারেন, বাস্তবিকই আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই।

যাহা হউক, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এই দুইটি অভিযোগের নিরর্থক পুনরুল্লেখে "চর্ব্বিত চর্ব্বণের"ও চর্ব্বণের ও উদ্গিরণের নিদর্শনমাত্র পাইলাম, আর অধ্যাপক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইলে আমরা নিরুপায়, কেন না, তাঁহার কথাতেই বলিতে হয় যে, এরূপ চর্ব্বিত-চর্ব্বণের পুনরুল্লেখে "বড় বেশী বৈচিত্র্য নাই।"

নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এতদূর অসংবদ্ধ যে, কোন কোন স্থানে বিকারের প্রলাপের মত শুনায়। প্রলাপ অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী হয়। অধ্যাপক মহাশয়ের নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর মন্তব্যগুলিও স্থানে স্থানে পরস্পর-বিরোধী। নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক বলিতেছেন যে,—

—১) ইহা নিজের রূপ বজায় রাখিয়াও (মাইকেল) "ডিমক্রেটিক" (?) হইতে পারিয়াছে।

—২) আন্তর্জ্জাতিক ভাবের অবাধ আমদানী ইহাকে নমস্ত ও বরেণ্য করিয়াছে।

—৩) কেবল ধর্ম্মমতের প্রকাশই আর সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নহে।

—৪) সাহিত্যের "বস্তু" (?) আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই।

—৫) সাহিত্য এখন বহুমুখী।

—৬) গত ৫০ বৎসরে সাহিত্য "সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ, তরুণ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।"

—৭) সাহিত্য এখন dynamic বা গতিশীল।

—৮) পুরাতন সাহিত্য অপেক্ষা নূতন সাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছে।

—৯) নূতন বঙ্গ-সাহিত্যে বাহির হইতে গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধ্যাপক মহাশয় এই নূতন সাহিত্য সম্বন্ধেই আবার বলিতেছেন—

—১) নূতন সাহিত্যে একটা অবসাদের যুগ লক্ষ্য করা যায়।

—২) ইহা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের যুগ।

—৩) নূতন সাহিত্যের একটা আদর্শ নাই, মান (standard) নাই।

—৪) নূতন সাহিত্যের যে কোন্ দেশীয় পরিচ্ছদ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

—৫) এই সাহিত্যে যে প্রভাব পরিস্ফুট, তাহা দেশী নহে, বিদেশী।

—৬) আমাদের ভাষার ও জীবনের যথার্থ ইতিহাস নাই।

—৭) নূতন সাহিত্যে পুরাতনের উপর সে ভক্তিশ্রদ্ধা, সে অনুরাগ নাই।

—৮) এখন নাকি আবার পুরাতন আদর্শকেই বরণ করিয়া আনিতে হইবে।

—৯) সাহিত্যের নামে নাকি সব ব্যভিচার—ইত্যাদি মাসিকপত্রে (?)

—১০) এ হেন যুগে সাহিত্যে সৃষ্টি-কৌশল অসম্ভব।

—১১) সুতরাং ইহা সমালোচনার যুগ, সৃষ্টির যুগ নহে।

আর এই সমালোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন যে, "লিখিলেই ছাপানো যায়, চেষ্টা করিলে পকেটেও কিছু আসিতে পারে।" আমরা বলিব, তা পারি; অথচ তাহা 'পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যে'র সমালোচনা না হইয়াও পারে। তবে ভারতবর্ষের রেট্ আমরা জানি না।

অধ্যাপক মহাশয় নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাল ও মন্দের দিক্ দেখাইতে গিয়া তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্পর্ক ও অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখাইতে পারেন নাই, অথচ সাহিত্য একটা— "living organism", "dynamic", "progressive" এমন কি, "amorphous growth", এই সমস্ত ইংরেজী শব্দ নির্বিচারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশের আধুনিক অধ্যাপকেরা হয় ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, না বুঝিলে বুঝান যায় না। পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে তিনি একটা সামঞ্জস্য-স্থাপনের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই, করিতে পারেন নাই; অধ্যাপকের বক্তব্যের মধ্যে এইখানেই গুরুতর ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

পুরাতন সাহিত্যের পক্ষপাতিগণ নূতন সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা করিতেছেন,

নূতন সাহিত্যের উকীলগণ পুরাতন সাহিত্যকে আমলই দিতেছেন না। এই দুই শ্রেণীর সমালোচনাই একে অন্যকে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর সমালোচনায় বহু পরিমাণে একদেশদর্শিতা আছে। একদেশ-দর্শিতা সমালোচনার গুণ নহে, দোষ।

"ই-ব্রা-হি-ম" ? সাহিত্য।—নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক মোহিনী-মোহন মুখোপাধ্যায়ের আর একটি গবেষণা এই যে, এই সাহিত্যকে নাকি "ইব্রাহিম" সাহিত্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক বলিতেছেন,—"এক ব্রাহ্মণ যুবক একবার এইরূপ বিচিত্র পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া উৎসবগৃহে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের অশেষ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। * * সেই ব্রাহ্মণ যুবকটি বলিল, 'মহাশয়গণ, আমার নাম ইব্রাহিম,—আমি না ইংরেজ, না ব্রাহ্মণ, না হিন্দু, না মছলমান,—অথচ এই চারি জাতির সমন্বয়েই আমি ই-ব্রা-হি-ম।' গল্পে কথিত এই ভদ্র যুবকটির মত, আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-ভাষাকে যদি আমি ইব্রাহিম ভাষা বলি, আশা করি তাহা হইলে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না।"

অতঃপর যদি প্রশ্ন উঠে,—ততঃ কিম্? অধ্যাপক মহাশয় তদুত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সেই 'আধুনিক বিরাট্ প্রশ্নটি'রও 'সমাধান চেষ্টা' করিয়াছেন। অধ্যাপকের বক্তৃতা, যথা—"বায়োস্কোপের ছায়াবাজীর মত,গানের সুরের মত, নদীর বীচিমালার মত, এই জীবন ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহার যতি নাই, শেষ নাই। জীবনের ধর্ম্মই এই যে, ইহা dynamic বা গতিশীল। জীবনের এই dynamic ভাব জীবন-মুকুর সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য dynamic বলিয়াই আজ তাহা ইব্রাহিম। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আক্ষেপের কারণ কি আছে?" কিছু না। তবে একটা আক্ষেপ—থাক্ সে কথা।

বক্ষ্যমাণ অধ্যাপক, সাহিত্যকে একটা "প্রাণময় পদার্থ (living organism) বলিয়াছেন। সাহিত্য একটা জীবন্ত পদার্থ। ইহার জীবন আছে, কাজেই ইহার গতি আছে। আর এই নশ্বর সংসারে যেখানে 'স্ফুটতরদোষাঃ',—সেখানে গতি থাকিলেই উন্নতি ও অবনতির যুগপৎ অবসর আছে। কিন্তু যাহার জীবন আছে, তাহার একটা দেহও আছে, এ কথা নিতান্ত নিরাকারবাদী ভিন্ন সম্ভবতঃ সকলেই রাজা রামমোহনের ভাষায়—"এই অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সংবলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট ঘটিকাযন্ত্র

অপেক্ষা অতিশয় আশ্চর্য্য—ইত্যাদি” যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সাহিত্যের প্রাণ ও দেহ যদি থাকিল, উন্নতি ও অবনতিমূলক গতি যদি থাকিল, তবে তাহার একটা ব্যক্তিত্বও অবশ্য থাকিবে। প্রত্যেক জীবন্ত সাহিত্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। তাহার সাহিত্যের এই ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য একটা অচল ‘কেটিস্’ (?) নহে,—যেমন কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন। ইহা একটা সচল দেহ ও প্রাণের জীবন্ত গতির মধ্যেই প্রকট। সাহিত্যের যদি জীবন থাকে, তবে তাহার মৃত্যুও কল্পনা করিতে হইবে। কেন না, ঋষি বলিয়াছেন যে, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি। ইহা ব্যঙ্গ নহে - সত্য।

জীবন্ত সাহিত্য গতিশীল। আর মৃত সাহিত্য কাজেই গতিহীন। মাননীয় অধ্যাপকের বক্তব্যে দৃষ্ট হয় যে, তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ‘ইব্রাহিমত্ব’কেই তাহার গতিশীলতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্য ‘ইব্রাহিম’ হইলে, তাহার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় কি না ?

যে কোন সভ্যজাতির সাহিত্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই সেই সাহিত্যের প্রাণ বা আত্মা। সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য তাহার গতির পরিপন্থী ত নহেই, পরন্তু কোন সাহিত্যই তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া গতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কোন বিশেষ সাহিত্য যে মুহূর্ত্তে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার গতিও হারাইয়াছে। সাহিত্যের সেই গতিহীন অবস্থার নামই মৃত্যু। সুতরাং প্রাণময় যে সাহিত্য, তাহাকে সচল ও জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যকেও অব্যাহত রাখিতে হইবে।

ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক সভ্যজাতির সাহিত্যের যে কেন একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা দেয়, তাহা সাহিত্যের ইতিহাস, অভিব্যক্তি ও দর্শন আলোচনা করিয়া যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন, - তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপকের আশঙ্কিত “চর্ব্বিত-চর্ব্বণের” যুগে তাহার পুনরুল্লেখ আর না করাই সঙ্গত। বিচিত্র জল-বায়ু, বিচিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়াও সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট রূপ-সৃষ্টির আরো গুরুতর কারণ আছে। জগতে প্রত্যেক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতির সভ্যতা ও সাধনা একই মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াও ঐতিহাসিক বিকাশের পথে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। বিকাশের পথেই বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের জন্যই প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির একটা বিশিষ্ট রূপ, এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির এই বিশিষ্ট রূপই তাহার সাহিত্যে প্রতিফলিত। যে জাতির সাহিত্য তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে,—নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, সে জাতিও তাহার বিশিষ্ট ‘নামরূপ’ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার ও নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ ও সুরের কথা আমরা বহুবার বলিয়া আসিতেছি। কেন না, ভারতীয় এবং পৃথিবীর জাতিসকলের মধ্যেও বাঙ্গালী জাতির যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বিশ্বাস করি এবং ভয় না করিয়াই ঘোষণা করি। বাঙ্গলার এই বিশেষ সভ্যতা, বাঙ্গালীর এই বিশেষ সাধনা, তাহার সাহিত্যের একটা বিশেষ রূপ ও সুরের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্য, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বেও গতিশীল অর্থাৎ অধ্যাপকের কথায় living organism ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অতি প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস আছে। আধুনিক ইতিহাসে এম, এ, না জানিলেও আমরা বলিতে কোন দ্বিধা বোধ করিব না যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য গতিশীল, এবং অধ্যাপক মোহিনীমোহন শুনিয়া হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 'ইব্রাহিম' অন্ততঃ "-ব্রাহিম," না হইয়াও গতিশীল। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, কাজেই তাহার গতিও হারাইয়াছিল না।

নূতন বাঙ্গলা-সাহিত্য "ইব্রাহিম" হইলে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইবে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপনের পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিব, যাহাতে আমাদের বিশ্বাস, ঐ প্রশ্ন উত্থাপনের আর বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'নব-বিধান' করিয়াছিলেন,—তাহার মূলে একটা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বিরাট্ স্বপ্ন ছিল। তথাপি সমাজ ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করাতে কেশবচন্দ্রের "নব-বিধান" ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিদের নিকট হইতে অতিশয় কঠোর সমালোচনার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। যেমন সাহিত্য, তেমনি ধর্ম্মও একটা প্রাণময় পদার্থ; এবং তাহাও একটা বিশেষ জাতির বিশেষ সভ্যতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকিয়া একটা বিশেষ রূপে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রাণময় পদার্থগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। হিন্দু-ধর্ম্মের মস্তক, মুসলমান-ধর্ম্মের বক্ষ, খৃষ্টান-ধর্ম্মের হস্তপদ ইত্যাদি লইয়া আর একটা জীবন্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি করা চলে না। ব্রহ্মানন্দের কল্পনা বিশ্বব্যাপী উদার, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বিজ্ঞান-বিরোধী, জীবনের নিয়ম-বিরোধী, হাস্যকর ও উদ্ভট। জড়পদার্থ সৃষ্টি করিতে যে উপায় কার্য্যকারী হইতেও বা পারে, প্রাণময় পদার্থের সৃষ্টিতে সে উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় তাহা চলে নাই।

ঠিক এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের 'সৃষ্টি', যদি ইহা অধ্যাপকের মতে একান্তই সৃষ্টির যুগ না হয়, তবে এমন কি, 'সমালোচনা'ও চলিবে না। সাহিত্য প্রাণময় পদার্থ। বিভিন্ন প্রাণময় পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেলাই করিলে অতি বড় খলিফা ব্যক্তিও আর একটা প্রাণময় বস্তু বা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কেন না, প্রাণময় পদার্থের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণহীন। আর প্রাণহীন কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে সৃষ্ট যে বস্তু, তাহাও কাজেই প্রাণহীন।

কাজেই 'ইব্রাহিম'-সাহিত্য প্রাণময় জীবন্ত সাহিত্য হইবে না। তাহা 'ইব্রাহিম'-নাম-ধেয় জড়পদার্থ হইবে। অধ্যাপক যাহাই বলুন, নূতন বাঙ্গলা সাহিত্যকে আমরা জড়-পদার্থ করিতে প্রস্তুত নহি। 'ইব্রাহিম'-জামা কোন দরজি হয় ত সেলাই করিয়া দিতে পারেন। অবশ্য, আমরা তাহারও পক্ষপাতী নহি। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিতেও "ইব্রাহিম"-সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং যাহা অসম্ভব ও উদ্ভট, তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইবে, কি পাইবে না, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের প্রশ্ন, কেন এই উদ্ভট হাস্যকর বিজৃম্ভণের অবতারণায় বাঙ্গলা মাসিকের পক্ষ ও বক্ষ ভারাক্রান্ত হয়? আমাদের উত্তর এই, পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি আদর্শ একে অন্যকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে এক মহা যুদ্ধের সূচনা করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রান্ত আদর্শগুলি গত ও মৃতপ্রায়, উদীয়মান নূতন আদর্শ সকল বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে সম্যক্ সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারিতেছেন না, অথচ মাসিক পত্রে কোন কিছু একটা লিখিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের নাহক্ অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলেই, এই দারুণ গ্রীষ্মেও আমরা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার অবকাশ পাইতেছি না। সম্যক্ অচিন্তিত চিন্তা নিতান্তই দুষ্পাচ্য ও অজীর্ণের কারণ হয়।

শ্রী—

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা]   [আষাঢ়, ১৩২৬ সাল।

নারায়ণ

বেণের মেয়ে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

(৪)

মহাবিহার ও গঙ্গার মধ্যস্থলে মহাসভা হইয়া গেল, রূপা রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ ও হরিবর্ম্মার হিন্দুরাজ্য স্থাপন হইয়া গেল। বিহারী সাতগাঁ রাজ্যের সমস্ত ভার পাইল, লোকে খুব খুসী হইল। কিন্তু অনেকের আবার এই সকল ব্যাপারে মর্ম্মান্তিক হইল। বৌদ্ধ যাহারা ছিল, তাহাদের ত রাজ্য গেল, রাজা গেল, দেশে যে দব্‌দবা ছিল, সেটি গেল, মহাবিহারও গতপ্রায়, তাহারা বড় খুসী হইতেই পারে না।

এখন আবার এক সভা হইবে। সেটা রাজার খাস সভা, তাহাতে সাতগাঁ-রাজ্য বাঁটোয়ারা হইবে। যাঁহারা হরিবর্ম্মার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজ্যের যাহাতে সুশৃঙ্খলা হয়, তাহা করিতে হইবে। আর মোট কথাটা, বৌদ্ধেরা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক লেখাপড়া চাই, অনেক সন্ধান লওয়া চাই, অনেক পরামর্শ চাই, অনেক বিবেচনা চাই। সুতরাং কিছু দিন সকলকে সাতগাঁয়ে থাকিতে হইবে। এই কিছু দিনের মধ্যে তারাপুকুরের কেল্লাটা নূতন করিয়া গড়া চাই। ছাউনি, রাউতপাড়া সব নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করা চাই। চারিদিকে লোক লাগিয়া গেল। সাতগাঁ বেশ সরগরম রহিল।

এই দীর্ঘকাল মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা, যদিও বয়স হইয়াছে, মাছ ধরা, কুমীর মারা, হাঙ্গর ধরা, শীকার করা, বাজপাখীর খেলা করা, এই সব লইয়াই রহিলেন। সাতগাঁ ও মহাবিহারের সম্মুখে গঙ্গা খুব চওড়া, একটা সমুদ্রের খাড়ীর মত, মাঝে মাঝে বালীর চড়া। দু'একটা চড়ায় মাটী আছে, আর তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল;—আসসেওড়া, পটপটী, বন-ঝাউ, নানারকমের লতা, কাঁটাগাছ, কাঁটানটে, কণ্টিকারি, কালকাসন্দা, চাকচাকন্দা, শ্যালকাঁটা, ফেনী মনসা, গোয়ালে লতা। এই সবের মধ্যে পা বাড়ান যায় না। আবার ওপারে দূরে সুন্দরবন—সুঁদরীগাছ, বেতগাছ, গোলপাতার গাছ, সঙ্গে সঙ্গে নোনা, ভাটুই, গম্ভীরা, জীবন, জিউলী—সেও খুব ঘন, তার নীচেও আবার ঘন বন। মহারাজাধিরাজের ভারি আমোদ—বালীর চড়ায় কুকুর ছাড়িয়া দেন, তাহারা খরগোস, শজারু, গোসাপ, গন্ধগোকুলা ধরিয়া লইয়া আসে। খরগোসও ছোটে, পিছু পিছু কুকুরও ছোটে। দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। আবার দু'মিনিট পরে কুকুরটা খরগোসটিকে দাঁতে ধরিয়া মহারাজাধিরাজকে পুরস্কার দেয়। মহারাজাধিরাজ কুকুরের গায়ে হাত দিয়া তাহাকে আদর করিলেন, সে আবার আর একটা কি দেখিয়া ছুটিল। তাহার আদর দেখিয়া আর পাঁচটা কুকুরও আপন আপন বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ছুটিল। একবার পাঁচ সাতটা কুকুরে একটা নেকড়ে বাঘকে তাড়া করিয়াছে, সে চারিদিকে ছুটিতেছে। কোথাও পরিত্রাণ নাই দেখিয়া, যে দিকে রাজা ছিলেন, সে সেই দিকে ছুটিল। রাজা ও শীকারীরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু দূর হইতেই মহারাজাধিরাজের এক তীরে তাহার জীবন শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানারকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়; কত রকম শব্দ করে, গান করে, খেলা করে; আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ এক একদিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে, পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্ চিল্ চিল্ চিল্ শব্দ করিত, এক একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর একটার উপর ধাওয়া করিত। নীচে লোক পাখী কুড়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিত। মরা পাখী কতক মাটীতে পড়িত, কতক জলেও পড়িত, কিন্তু একটিও নষ্ট হইত না। কাছে হইলে লোকে জলে পড়িয়া সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আর দূরে হইলে ডিঙ্গী ত ছিলই।

সকালবেলা নদীর ওপার জঙ্গলের নীচে চড়ার উপর বাতী শালকাঠের মত কি পড়িয়া থাকিত। যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে, বাহাদুরী কাঠ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, সেগুলা কুমীর, নানাজাতীয় কুমীর। মহারাজাধিরাজ কুমীর শীকারের জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে বর্শা, বল্লম, কোঁচা আর চতুর কয়েকজন শীকারী।

কুমীরের গায় বল্লম বসে না। তাহাদের চোখে না হয় মুখে বিঁধিতে হয়। রাজা অনেক ধস্তাধস্তির পর কুমীরের মুখে বর্শা চালাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড কুমীর এক মোচড়ে বর্শা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িল; কিন্তু ভাঙ্গা বর্শা বাধিয়া থাকায় তাহার নড়াচড়ার পক্ষে বড়ই উৎপাত হইতে লাগিল। একটু চাড় পাইলেই মুখে লাগে আর যন্ত্রণায় কুমীর অস্থির হয়। শেষে সে ভাসিয়া উঠিল—অমনি প্রকাণ্ড কাছী আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। কুমীর মহাশয় মরিলেন, পেট চিরিয়া তাঁহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করা হইল, পেটের মধ্যে তুলা ও বিচালির কুচি পূরিয়া দেওয়া হইল, আবার সেলাই করা হইল। তিনি বহুকাল ধরিয়া রাজবাড়ীর দেউড়ীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শব্দভেদী বাণের তখন খুব চলন ছিল। আর রাজা হরিবর্ম্মা শব্দভেদী বাণে খুব দক্ষ-হস্ত ছিলেন। নৌকায় বসিয়া যেই শুনিলেন, একটা শুশুক কি ঘড়েল ভুস করিয়া উঠিল, অমনি রাজার বাণ চলিল। সে বাণ অব্যর্থ। শুশুককে মরিতেই হইবে। আর শীকারীরা যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাজার সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিবে। শুশুকের তেল বাতের বড় ঔষধ ছিল।

হাঙ্গর এক ভয়ানক জন্তু। দেখিতে বড় আড়মাছের মত, মুখের গোঁড়া থেকে দু'খানা হাড় বাহির হইয়াছে, হাড় দু'খানার দু'ধারে দু'সারি করিয়া দাঁত; উপর নীচের চারি সারি দাঁত একত্র হইলে চারখানা করাতের কাজ করে। হাঙ্গরে কাটিলে তাই করাত-কাটার মত পরিষ্কার কাটা দেখা যায়। রাজাধিরাজের শব্দভেদী বাণে অনেক হাঙ্গর, আপন হাঙ্গরলীলা সংবরণ করিয়া, বহুসংখ্যক নিরীহ মনুষ্য ও জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকার কারণ হইয়াছিল।

নৌকায় বাচখেলা মহারাজের আর এক আমোদ ছিল। বড় বড় জাহাজ লইয়া বাচ খেলা হইত। এ নৌকা পলাইতেছে, আর একখানা তাহার পিছন লইয়াছে। আর এক-খান প্রথমখানাকে রক্ষা করার জন্য যাইতেছে। একখান ঘুরিয়া মহাবেগে আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়খানার মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রথমখানার পলাইবার পথ করিয়া দিতেছে। জল তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। জলজন্তু সব ভয়ে পলাইতেছে ও ভাসিয়া যাইতেছে। জল-জন্তুর পিছনে আবার ডিঙ্গী, পান্‌সী, বর্শা, বল্লম লইয়া ধাওয়া করিতেছে।

এই সব লইয়া মহারাজাধিরাজের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। যে কেহ দেখা করিতে আসিত, তাহাকেই আপ্যায়িত করিতেন, তাহার কি বলিবার আছে, শুনিতেন। অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া সিপাহীদের কুচ-কাওয়াজ দেখিতেন। একদিন তারাপুকুরে মেরামত দেখিতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সর্ব্বদাই সাতগাঁয়ে অলিগুলী কুচ করিয়া যাইত। শুধু যে সৈন্যরাই যাইত, এমন নহে। নৌকার মাঝিরা, খালাসীরাও সাজিয়া কুচ করিতে যাইত।

যখন ভবদেব আসিতেন, মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেন।

মহারাজ রণশূর সর্ব্বদাই মহারাজাধিরাজের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ ও বেশ মিষ্টভাষী। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। শীকারে তিনিও খুব মজবুত। কিন্তু সে মজবুতি সাকরেদী—ওস্তাদী নয়। মহারাজাধিরাজ, রণশূরকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি কাছে থাকিলে খুসী থাকিতেন। দু'জনের বেশ ভাব হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ যেখানে যাইতেন, রণশূরও সেইখানেই যাইতেন। যে সব খেলার কথা বলা হইল, সর্ব্বত্রই দু'জনে থাকিতেন। জলে খেলা রণশূরের বড় একটা অভ্যাস ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি বেশ পাকিয়া উঠিলেন। তাঁহারও বাজপাখী ছিল, শীকারী কুকুর ছিল। তিনিও তীর-ধনুক লইয়া শীকার খেলিতেন, বর্শা-বল্লম ব্যবহার করিতেন।

(৫)

আর ভবদেব কি করেন? তিনি একখানি বড় বজরা লইয়া ত্রিবেণীর পাশে সপ্তর্ষি-ঘাটে বসিয়া থাকেন। বজরায় একটি আপিস; একজন বৃদ্ধ কায়স্থ, তাহার নীচেও অনেকগুলি কায়স্থ। সবাই নিরন্তর ঘাড় গুজিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ভবদেবের কাছে দিনরাত্রি লোক আসিতেছে। বিহারী প্রায়ই আসিতেছেন ও পরামর্শ করিতে-ছেন। গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোনও কাজেই ভবদেব বজরা হইতে নামেন না। কেবল একদিন নামিয়াছিলেন ব্রহ্মপুরীতে নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য, একদিন বিহারীর বাড়ী পায়ের ধুলা দিবার জন্য, আর একদিন মহাবিহারের ঠাকুর দেখিবার জন্য। ভবদেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, হেরুক ও বজ্রবারাহীর মূর্ত্তি অত ভয়ানক, তাই স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিয়া "নগ্নদর্শন" অর্থাৎ নেঙ্‌টা লোক দেখিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত করেন। স্মৃতিকারেরা বলেন, নগ্ন বলিতে বৌদ্ধও বুঝিতে হয়।

যাহার যাহা বলার আছে, সকলেই ভবদেবের কাছে বলিয়া যাইতেছে। ভবদেব সব কায়স্থের দ্বারা লিখাইয়া রাখিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বড়ই মুস্কিল। অধিকাংশ কায়স্থই বৌদ্ধ। অনেকেই বজ্রযান ও সহজযানের বই লিখিয়াছেন। সুতরাং নিজের কায়স্থ লইবার সময়ে ভবদেবকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের ব্রাহ্মণ গাঁঞীদের গ্রাম হইতে অতি গরীব কায়স্থ আনিয়া মুহুরী করিয়াছিলেন। যাহাদের অন্যরূপে জীবিকানির্ব্বাহের কোনওরূপ সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের একেবারে লয়েন নাই। ইহারাও প্রাণপণে তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছে, কখনও গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই। উঁহাকে তাহারা আপনাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলিয়া মনে

করিত। উহাঁ হইতেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পায়, ভবদেব তাহাদের এরূপ অর্থ দিতেন না।

ভবদেবের কাছে ব্রাহ্মণেরা আসিত বৃত্তির জন্য, দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্য্যেরা আসিতেন পূর্ণপাত্রের জন্য, বেণেরা আসিত ব্যবসার স্নবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমী ও জায়গীরের জন্য, জুগী-জোলা-তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার স্নবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলীরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধেরা আসিত তাহাদের উপর অত্যাচার না হয়, সেইটা প্রার্থনা করিবার জন্য। তিনি যাহার সঙ্গে যেমন করা উচিত, তেমনি ব্যবহার করিতেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইত যে, ভবদেব তাহাকে ভালবাসেন।

ভবদেবেরও দিনরাত অবসর ছিল না। ত্রিসন্ধ্যা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাই করিতেন। নইলে তাঁহার খাওয়া শোওয়ার অবসর ছিল না। যখন অন্য কেহ থাকিত না, তখন তিনি, কায়স্থেরা দিনভর কি লিখিয়াছে, তাহাই শুনিতেন ও তাহার উপর আপনার যা বলার ছিল, লিখাইয়া রাখিতেন।

বিহারীরও অবসর বড় কম। তাহার কাছেও ঢের লোক। তাহার পোষ্যপুত্র লওয়া হইতেছে না। আগামী খাসদরবারের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাহার একটা বেশী কাজ ছিল, তাহাকে ঘুরিয়া খবর যোগাড় করিতে হইত। কেননা, রাজা ও ভবদেব তাহার কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

(৬)

পঁচিশ ছাব্বিশ দিনের পর হরিবর্ম্মার বড় নৌকায় সভা বসিল। মহারাজাধিরাজ, মহারাজ, ভবদেব ও বিহারী এই চারিজনেই সভা। আর লোক আবশ্যকমত আসিতেছে, আপনার কাজ করিয়া দিয়া যাইতেছে। প্রথম উঠিল রাজ্য-ভাগের কথা। হরিবর্ম্মা বলিলেন, "রণশূরের সম্পোষামত দামোদরের ওপারের যত গ্রাম উনি চান, দিয়া দাও। কেমন হে ভায়া, তাতে তোমার হবে ত?" রণশূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত গ্রাম আছে?" উত্তর হইল, "২৩৮ খানা, তাহার মধ্যে তোমাকে ১৫০ গ্রাম দেওয়া যাইতেছে। কেবল কয়েকটা ঘাটী আগলাইয়া রাখিবার জন্য ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিতেছি। তোমার সঙ্গে আবার ঘাটী কি? কিন্তু উত্তরে ১১টা ঘাটী আছে। ফী ঘাটীতে আটটা করিয়া ৮৮ খানা গ্রাম আমি রাখিলাম। নহিলে জান ত, বিষ্ণুপুর আছে, মহীপাল আছে, এরা যদি ঘাটী খোলা পায়, আমারও ক্ষতি করিবে, তোমারও ক্ষতি করিবে।" রণশূর ইহাতে বেশ খুসী হইয়া গেলেন। তাহার পর রূপরাজার পরিবারবর্গের প্রতিপালন। সে একটি বই বিবাহ করে নাই, তাহারও সন্তান-সন্ততি হয় নাই। রাজা তাহাকে হাজার টাকা

মাসিক দিবেন, আর তাহাকে গঙ্গার ওপারে চাকদহের কাছে বাস করিতে দিবেন। সে সেখানে ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে। ভবদেব বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে মহারাণী অধিরাণীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন, তিনি কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে বাস করিবেন।" "বেশ ত, তিনি নালন্দা, বিক্রমশীল, বুধগয়া, কুশীনগর, ঋষিপত্তন, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন।" "রাণী বলিয়াছেন, তিনি আপাততঃ হরিহরপুরে থাকিবেন। পরে সেখান হইতে পুরী যাইবেন।" "বেশ ত, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।"

তাহার পর ব্রাহ্মণদের পুরস্কার। "তাঁহারা সকলেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অনেকেই যুদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে পরিশ্রম করিয়া বূহরচনা, দুর্গসংস্কার প্রভৃতি শিখিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার বিলক্ষণ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" "কত জন পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছ?" "একশত পনর জন।" "বেশ, এক এক জনকে এক একখানি গ্রাম দাও।" "মহারাজ, তাহাতে ত আমার কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি পাইলেন কি যে, এত দান করিবেন? দেখুন, দামোদরের ওপারে যে ৮৮ খানা গ্রাম রহিল, তাহাতেও ঘাটী আগ্‌লাইবার খরচ কুলাইবে না। আর এপারে যে সব গ্রাম, তাহার ত ৫০ খানি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ মহাবিহারকেই দান করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক বিহারই ত ৫।৬ খানা গ্রাম ভোগ করে। আপনি তাহার উপর আবার ১১৫ খানা ছাড়িলে এক সাতগাঁ বন্দর ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।"

"তুমি কি বল?"

"আমি বলি, যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ১০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি দেওয়া হউক। আর যেখানেই ব্রাহ্মণের ভূমি দিবেন, তাহার একটা সীমানা যেন একটা বৌদ্ধবিহার বা তাহার জমীর সঙ্গে লাগাও থাকে, এরূপ করিলে ১১৫টা গ্রামের বদলে ১৫।২০ দিলেই চলিবে। আর ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম এখন আর উঠতি মুখে নাই, উহা ক্রমেই পড়িয়া যাইতেছে।"

"বুঝেছি, তোমার মতলব বুঝেছি। বৌদ্ধদের জমীগুলা ব্রাহ্মণসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরাণে যে লিখেছে যে, দেবোত্তরের কাছে কাহাকেও ব্রহ্মোত্তর দিবে না।"

"সে মহারাজ, আমাদের দেবতাদের কথা। বিধর্ম্মীদের দেবতা আমরা দেবতা বলিয়া মানি না। এই যে দিন মহাবিহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতে গিয়াছিলাম, কামশাস্ত্রের ছবিতেও অত অশ্লীল মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। এই মূর্ত্তি আমি ত দেবতা বলিয়া মানিতে পারি না। তবে যে ভাঙ্গি না, সে কেবল মিছে একটা গোলযোগ বাধান দরকার কি বলিয়া। নহিলে হেরুক-মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সে দিন হইতেই রাগ হইয়াছিল।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি নাই, ক্রমেই অধোগতি হইবে?"

"মহারাজ, এত দিন সমাজ হইতে ভিক্ষু সংগ্রহ হইত, সংঘ পূরিত, এখন উল্টা

হইয়াছে। এখন সংঘ হইতে সমাজে লোক আসিতেছে। সমাজ তাহাদের লইতে পারিতেছে না। মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন সংঘের আঁট ছিল, সংঘে স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে পারিত না, সংঘে ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না, ততদিন সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেণে, তেলি সংঘে গিয়াছে। সমাজ সংঘের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? সংঘে সকলেই শক্তি লইতেছে। বলে—শক্তি নহিলে সাধনা হয় না। সাধনা যত হউক না হউক, হইতেছে ছেলে-মেয়ে। প্রথম প্রথম সেগুলাকে দশশীল আওড়াইয়া সংঘে লইত, এখন এত বেশী হইয়াছে যে, সংঘে আর ধরে না, সেগুলার জন্য নূতন বিহারও আর হইতেছে না। সুতরাং সেগুলা সমাজে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে ত তাহাদের স্থান নাই। বৌদ্ধ-সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য নাই। সেখানে তাহারা স্থান পাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় কি হইবে? সকলেরই ত একটা একটা ব্যবসায় আছে। নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা দাঁড়ায় কোথায়? তাই একজন বড় রাজা তাহাদের যুগী উপাধি দিয়া তাহাদের মোটা কাপড় বুনিতে দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সমাজ সংঘ পোষণ করে না। সংঘের লোক সমাজে আসিয়া ভিড়িতেছে। এই ত ধ্বংসের অবস্থা। ভিক্ষুদের ভিক্ষা সমাজের লোকে দিতে চায় না। তাহাদের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেও কুলায় না। সুতরাং কাপড়ের ব্যবসা যদি জাঁকিয়া উঠে, সব সংঘের লোক সেই দিকে ছুটিবে, বিহার পড়িয়া থাকিবে। সে বিহার জঙ্গল হইয়া যাইবে। জঙ্গল না হইয়া যদি ব্রাহ্মণের ভোগে আসে, ক্ষতি কি তাহাতে?"

মহারাজাধিরাজ বলিলেন,—"এ যুদ্ধ বেণেদের জন্য, জয়ও বেণেদের হইতে। বেণেরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।"

কি পুরস্কার দেওয়া উচিত, বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"বেণেরা জমী জমীদারী চায় না, ত্যাগ-দক্ষিণা চায় না। তাহারা চায় বাণিজ্যের একটু সুবিধা। তাহাও তাহারা ভুনী মালের ব্যবসা করে না, দেশী মালেরও ব্যবসা করে না। বিদেশী মাল, বিশেষ সাগরপারের মাল, যাহাতে অবাধে বিনা মাশুলে সাতগাঁ পৌছিতে পারে, এইটুকু করিয়া দিলে, বেণেদের যথেষ্ট উপকার করা হইবে। সাতগাঁই এ সকল মালের প্রধান আড্ডা। এখানে যা মাশুল আদায় হয়, তাহার উপর ৩৷৪টা মুনাফা চড়িয়া মাল মহার্ঘ্য করিয়া দেয়। যদি এ মাশুলটা এক টাকা কমে, তবে মালের দাম দুই টাকা কমিবে, সারা বাঙ্গলার উপকার হইবে। সারা বাঙ্গলার অর্দ্ধেক ত মহারাজাধিরাজের, উহাঁর প্রজাদের অনেক সুবিধা হইবে।"

মহারাজাধিরাজ।—তাহাতে রাজার যে বিস্তর লোকসান হে! এত লোকসান দিয়া রাজা রাজ্য চালাইবে কিরূপে?

বিহারী।—প্রজার দুই টাকা লোকসান করিয়া রাজার এক টাকা লাভ, বড় ভাল

কথা নয়। সে দু'টা টাকা প্রজার ঘরে থাকিলে প্রজাও দশের জন্য, দেশের জন্য ১০ টাকা খরচ করিতে পারিবে। রাজাও দরকার হইলে মাঙ্গন-মাথট করিয়া যথেষ্ট আয় করিতে পারিবেন।

সকলেই বিহারীর কথায় সায় দিল।

তাহার পরে কথা উঠিল কাপড়ের। ভবদেব বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা বাকলের অথবা রেশমের কাপড় পরেন, তুলার কাপড় অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা পূজা অর্চনা করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, রাঁধাবাড়া করেন রেশমের কাপড় পরিয়া, খাওয়া-দাওয়াও করেন রেশমের কাপড় পরিয়া। তবে অন্য সময়ে অনেকে তুলার কাপড় পরেন বটে; কিন্তু তাহাও পরা যায় না। কারণ, সব কাপড়েই ভাতের মাড়। নীচ জাতির এঁটো ছুঁয়ে অশুচি হইতে হয়। তাই আমরা রাঢ়ে ব্রাহ্মণদের গ্রামে জাত-তাঁতি বসাইয়া কাপড়ে খইএর মাড় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যুগীর কাপড় একেবারেই পরি না, স্পর্শও করি না। এখন ত দেশ হিন্দুর হইল। এখন এই কাপড়ের যাহাতে দেশে চলন হয়, তাহাই করিতে হইবে। জাত-তাঁতির হাত খুব সাফ। তাহারা খুব সরু কাপড় বুনিতে পারে। সে কাপড়ে খইএর মাড় যত পরিষ্কার দেখায়, ভাতের মাড়ে তেমনটা হইতেই পারে না।"

মহারাজাধিরাজ।—আমি তাহার কি করিতে পারি? সে হাত আপনাদের আর সে হাত বিহারীর। আপনারা যদি মনে করেন, শুচি কাপড়ই চলিবে, অশুচি কাপড় চলিবে না, যাহারা যুগীর কাপড় পরিয়া জল আনিবে, তাহাদের জল আপনারা লইবেন না বা স্পর্শও করিবেন না, ইহাতেই তাঁতির কাপড় চলিয়া যাইবে।

ভবদেব।—ব্রাহ্মণেরা তেলের ব্যবহার খুবই কম করেন। অনেকে সরিষার তেল মাখেন। কিন্তু অধিকাংশই তৈলস্নান করেন না। যাঁহারা তেল মাখেন, তাঁহাদের বড়ই অসুবিধা। এখানে ঘানির মুখে চামড়া দেওয়া থাকে, চামড়ার ঠোঙ্গা বাহিয়া একটি কলসীতে তেল পড়ে। চামড়ার স্পর্শে সে তেল অশুচি হয়। সে তেল কিছুতেই মাখা উচিত নয়। আমরা ব্রাহ্মণের গ্রামে বন্দোবস্ত করিয়াছি, একটা কাঠের কেট্‌কোর ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া ঘানিটি তাহাতে খুব আঁট করিয়া বসান হয়। ঘানি বহিয়া তেল কেট্‌কোয় পড়ে; কেট্‌কো ভরিয়া গেলে, নারিকেলের মালা করিয়া তেল একটি কলসীতে তুলিয়া রাখা হয়। যাহারা এইরূপে পবিত্রভাবে তেল তৈয়ারি করিবে, আমরা তাহাদেরই জল-আচরণ করিব। চর্ম্ম-তৈলের ব্যবহার এইরূপে কমিয়া যাইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ব্রাহ্মসমাজের কথা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আমরা এখন যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া জানি, তাহার উৎপত্তি প্রকৃত-পক্ষে রামমোহন হইতে নয়, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে। রাজার স্বর্গারোহণের পরে, বহুদিন পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজার ভজনালয়টিকে বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুগণ ও পরিষদবর্গ ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাঁহারা রাজাকেই ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন; রাজার অসাধারণ গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সঙ্গ করিতেন। যে আদর্শের প্রেরণায় রাজা জোড়াসাঁকোর ভজনালয়টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে আদর্শটি তাঁহাদের চিত্তকে তেমন অধিকার করে নাই। কাজেই রাজা যখন চলিয়া গেলেন, ইঁহারাও তখন এই অভিনব অনুষ্ঠানটি হইতে সরিয়া পড়িলেন। পড়িয়া রহিলেন এক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনিই রাজার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন; ইনিই এই ভজনালয়ের উপদেষ্টা ও আচার্য্য ছিলেন। রাজা বিলাত চলিয়া গেলে তাঁহারই উপরে এই ভজনালয়-পরিচালনার ভার পড়ে। রাজার পরলোকে এ-দায় একেবারেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মাথায় আসিয়া চাপিয়া বসিল। রাজার প্রতি ভক্তি বশতঃ আর নিজে যে কর্ম্মটি করিতেছিলেন, তার প্রতি মমতা বশতঃও বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজার ভজনালয়টিকে বুকে ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। এই পর্য্যন্ত রাজার প্রতিষ্ঠিত ভজনালয় বা ব্রহ্মসভা রাজার পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল।

এই ভজনালয়ে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইত। বেদকে অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য বলিয়া মানা হইত। এমন কি, মধ্যযুগের প্রথা অনুসরণ করিয়া, শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই বলিয়া, যবনিকার অন্তরালে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিতেন। কর্ণগোচর হইলেও রাজার ব্রহ্মসভায় এই বেদপাঠ ব্যাপারটা সাধারণ লোকের চক্ষুর্গোচর হইত না। এ সকল কিংবদন্তী ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, ইহা সকলেই জানেন। মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানির অনুসরণ করিয়া, বেদে শূদ্রের অধিকার নাই, কোথাও এমন কথা কহিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভজনালয়ের যে ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরাই যে সাধারণ লোকের দৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া উপনিষদ পাঠ করিতেন, এ কথা ঠিক।

এ সকল ক্রমে বদলাইয়া দেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র স্বানুভূতি বা "আত্মপ্রত্যয়ের" উপরে ধর্ম্মের ও সত্যের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এইখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজার পথ ছাড়িয়া নিজের পথ ধরেন।

ইহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। যেমন রাজার কর্ম্মের, সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও, তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিচার করিতে হয়। রাজা বা মহর্ষি কেহই সনাতন সত্যের প্রবক্তা হইয়া আসেন নাই। বৌদ্ধেরা যে চক্ষে বুদ্ধদেবকে, খৃষ্টিয়ানেরা যে চক্ষে যীশুকে, মুসলমানেরা যে চক্ষে হজরত্ মহম্মদকে দেখেন, ব্রাহ্মেরা কোনদিন রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথকে সে চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা ইঁহাদিগকে নিজেদের সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও উপদেষ্টারূপেই ভক্তি করেন; অবতার বা মেসয়া বা নবী বলিয়া গ্রহণ করেন না। অতএব রাজা এবং মহর্ষি উভয়েই নিজ নিজ কালধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছেন, এই কথা বলিলে বা মানিলে ইঁহাদের মর্য্যাদালঙ্ঘন হয় না।

রাজার সময় দেশের ও সমাজের যে অবস্থা ছিল, তিনি সেইরূপই ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মহর্ষি যখন রাজার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেশের অবস্থা তখন বদলাইয়া গিয়াছে। রাজা যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, মহর্ষির সময়ে সে সমস্যা ছিল না। মহর্ষি কলিকাতার ও বাঙ্গালাদেশের নূতন শিক্ষানবীশদিগের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই শিক্ষানবীশ-সমাজে নূতন শিক্ষার প্রভাবে তখন নূতন ভাব জাগিয়াছে; নূতন চিন্তা, নূতন প্রশ্ন, নূতন সন্দেহ, নূতন জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। জিজ্ঞাসা যেখানে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, মীমাংসা সেখানে এক হইতেই পারে না। সুতরাং রাজার মীমাংসা, মহর্ষির সময়ের ঠিক উপযোগী হইত না। এই কথাটি না বুঝিলে, অথবা মনে করিয়া না রাখিলে, মহর্ষি কেন যে রাজার পথ ধরিয়া চলিতে পারিলেন না, বা চলিলেন না, এই প্রশ্নের কখনই সত্য সমাধান হইবে না।

বলিয়াছি যে, রাজার সময়ে এ দেশে বলিতে গেলে কোন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসাই ছিল না। লোকে গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিত। এই সাধনে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া তত্ত্ব-বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতেন ও করিতেন। এ দেশে কোন দিনই সিদ্ধ মহাপুরুষের বা ভক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানীর একান্ত অভাব হয় নাই। কিন্তু ইঁহারাও গতানুগতিক-ভাবেই সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন ও সুকৃতিবলে সেই সাধনের চরমফলও লাভ করিতেন। জনসাধারণে তাঁহাদের সাধন-সম্পদ্ দেখিয়া বিস্মিত হইত। তাঁহাদিগকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত। শ্রদ্ধাবান্ লোকে তাঁহাদের নিকটে মন্ত্র-দীক্ষা লইয়া আত্মসমর্পণও করিত। কিন্তু কোনও জিজ্ঞাসার প্রেরণায় তত্ত্ব-বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইত না। এই জিজ্ঞাসা না জাগাইলে ধর্ম্ম ও সাধন সাধারণের পক্ষে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কখনই সজীব হইতে পারে না।

রাজা ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই জিজ্ঞাসা জাগাইতে হইলে সকলের আগে যাহা আছে, বা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি সন্দেহ জাগান আবশ্যক। লোকে তখন শাস্ত্রের অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক, তাহার প্রামাণ্য-মর্য্যাদা স্বীকার করিত। প্রচলিত ক্রিয়া-কর্ম্ম ও লৌকিক আচার শাস্ত্র-সম্মত ও বেদ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। শাস্ত্রে বিশ্বাস তখন দেশে প্রবল ছিল। কথার জোরে এ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল। দেশে তখন কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শাস্ত্রবর্জ্জিত যুক্তিবাদ প্রবল হয় নাই, সূচিত হইয়াছিল কি না, তাহাই সন্দেহ। সাধারণ লোকের মধ্যে যুক্তি শাস্ত্রানুগামী ছিল; শাস্ত্রের প্রতিকূলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুরাশা করে নাই। এ অবস্থায় সরাসরিভাবে শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়া কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তোলা, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা করা কখনই সম্ভব ছিল না। সুতরাং কাল-প্রভাবেই রাজা রামমোহনকে শাস্ত্রের আশ্রয়ে দেশের ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্ম-জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হয়।

দেশের লোকে শাস্ত্র মানিত বলিয়াই যে তিনি শাস্ত্র মানিতেন, এরূপ কল্পনাও সঙ্গত হইবে না। তাঁর অলোকসামান্য মনীষা শাস্ত্র-যুক্তির মধ্যে একটা সমীচীন সমন্বয় করিয়া লইয়াছিল। এই সমন্বয়টি সেকালের লোকের জন্যও অত্যাবশ্যক ছিল। অন্য পথে তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব ছিল না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন রাজার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেশের তখন অন্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। রাজা নিজে যে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফল তখন ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের শিক্ষার প্রভাবে নূতন ইংরাজিনবীশেরা ঐকান্তিক যুক্তিবাদী হইয়া উঠিয়াছে। তখন শাস্ত্রের দোহাই আর কেহই দেয় না, সকলেই শুদ্ধ স্বানুভূতির বা যুক্তির উপরে দাঁড়াইয়া, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্ম-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যুক্তিবাদের মুখে ঈশ্বর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে জীর্ণ শাস্ত্রের বাঁধ বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখা আর সম্ভব ছিল না। মহর্ষি স্বয়ংও এই যুক্তিবাদের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

তখনকার সময়ে এই নূতন শিক্ষানবীশ-সমাজে শাস্ত্রে কি বলে, এই প্রশ্নই কেহ তুলিত না। যুক্তি কি কহে, সকলে ইহাই জানিতে চাহিত। মহর্ষি এই প্রশ্নটারই সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইউরোপের যুক্তিবাদ, ও ইউরোপীয় দর্শন, তখন শাস্ত্র-প্রাধান্য উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিয়া ইনটুইষণের (Intuitien) উপরে ঈশ্বর-তত্ত্বের ও আত্ম-তত্ত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মানবের অন্তরে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা আছে। এই সকল স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপরেই মানবের যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা সম্ভব

হইয়াছে। কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ আছে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ তাহার অনুরূপ হইবেই হইবে, ইহাও একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। এ সকল ধারণা বা প্রত্যয় মানব-মনের প্রকৃতি-সিদ্ধ। এই সকল ধারণা বা প্রতীতিকেই মোটের উপরে Intuition বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। এ সকল প্রতীতির সত্যাসত্য কোন বাহিরের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ সকল প্রতীতির দ্বারাই জগতের যাবতীয় ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয়। শাস্ত্রাদির দ্বারা এ সকল প্রতীতির সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কারণ, এ সকল প্রতীতির উপরেই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, শাস্ত্রের উপরে ইহাদের প্রতিষ্ঠা নহে। এই ইন্টুইষণ-বাদের সবিস্তর আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে, আবশ্যকও নহে। তখনকার নূতন শিক্ষানবীশদিগের মনের ভাব ও চিন্তার গতি কোন্ পথে চলিয়াছিল, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই ইন্টুইষণের কথা এখানে বলিতে হইয়াছে। এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় তখন উনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর প্রখর যুক্তি-বাদের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিকে খৃষ্টিয়ান্ পাদ্রীগণ হিন্দুধর্ম্মের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া লোকের চিত্ত বিচলিত করিয়া তুলিতেছিলেন। দেশের লোকে খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্মের কথা তখন কিছুই জানিত না। রাজার গ্রন্থাদির প্রচারও লোপ পাইয়াছে। সুতরাং পাদ্রীদের ধর্ম্মের সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করা অল্পলোকেরই সাধ্যায়ত্ত ছিল। এই তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে একদিকে হিন্দুধর্ম্মের ও অন্য দিকে খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্মের উভয় ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, প্রামাণ্য, সাধন ও সাধ্যাদি সম্বন্ধে সবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দেশে এরূপ জ্ঞানী লোক তখন ছিলেন না, বলিলেও হয়। এই যে যুক্তির অস্ত্রে খৃষ্টিয়ান্ পাদ্রীরা হিন্দুর ধর্ম্মের উপরে আক্রমণ করিতেছিলেন, সে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মের প্রামাণ্য থাকে কি না, ইহা দেখাইবার কেহ ছিল না। এই জন্য পাদ্রীদের যুক্ত্যাভাসে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টিয়ান্ হইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই সকল ধর্ম্মবিশ্বাস পরিহার করিয়া প্রাচীন লোকায়ত মতের অনুবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থার মাঝখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি কহিলেন—তোমরা শাস্ত্র প্রামাণ্য মান না; আমিও মানি না। তোমরা যুক্তিকেই সত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর বলিয়া স্বীকার কর; আমিও তাহাই করি। কিন্তু যুক্তি অর্থ কি? যুক্তির প্রতিষ্ঠা কোথায়? যার চক্ষু নানা বর্ণের ভেদ দেখে না, অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়ের গঠনে বর্ণজ্ঞানের যন্ত্র নাই বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কোন্‌টা শাদা, কোন্‌টা লাল, ইহার প্রমাণ তাহার নিকটে করিবে কিসে? যার কানের বা মনের ভিতরে রাগরাগিণীর বোধের শক্তি নাই, তাহাকে সঙ্গীতের জ্ঞান দিবে কিরূপে? সেইরূপ আমাদের ভিতরে, আমাদের চিন্তার গঠনেতে, মনের মূলে, বুদ্ধির অন্তস্তলে যদি সত্যাসত্যের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের একটা স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতিগত অনুভূতি বা অবরোধ না

থাকে, তাহা হইলে যুক্তিবাদ বা হেতুবাদ দাঁড়াইবে কাহার উপরে? যুক্তিবাদ মানিলেই এই ইন্‌টুইষণবাদ বা আত্মপ্রত্যয়বাদ মানিতে হয়। জড়বিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি যে যুক্তির আশ্রয়ে আপন আপন অধিকারের সত্যের প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা করে, সেই যুক্তির ভিত্তি আমাদের ইন্‌টুইষণ বা সহজ-জ্ঞান। আবার অবাঙ্‌মনসোগোচর যে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল, তাহাও এই সহজ-জ্ঞান, বা আত্মপ্রত্যয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সকলেরও প্রতিষ্ঠা যুক্তিমূলক, কল্পনামূলক, কিম্বদন্তীমূলক, বা শাস্ত্রমূলক নহে। এই পথেই মহর্ষি তাঁর নিজের ধর্ম্মাঙ্গ জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিয়াছিলেন। এই পথেই তাঁহার সমসাময়িক নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীদিগের ধর্ম্মজিজ্ঞাসার মীমাংসা সম্ভব ছিল। রাজার পক্ষে এটি সম্ভব হইত না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে এ দেশের শিক্ষিত-সমাজের মতিগতি কিরূপ ছিল, চিন্তা ও ভাবনা কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল, লোকের মনে কিরূপ সন্দেহ এবং কোন্ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, এখানে তাহাই দেখিতে হয়; কারণ, তাহার দ্বারাই দেবেন্দ্রনাথ যে কাজটি করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

আর এটি করিলেই আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই যে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজার পথ ধরিয়া চলা কিছুতেই তখন সম্ভব ছিল না। সে পথে চলিলে হয় ত তিনি নিজের ব্যক্তিগত সাধনে ও ধর্ম্ম-জীবনে শাস্ত্র, স্বানুভূতি ও সদ্‌গুরুর সমন্বয় করিয়া উচ্চতর বৈদান্তিক কিম্বা বৈষ্ণব-সাধনায় অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিতেও বা পারিতেন। কিন্তু দেশের ও সমাজের নূতন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার একটা মীমাংসার পথ দেখাইয়া একদিকে নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের ও নাস্তিকতার এবং অন্যদিকে মামুলি খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রচার কিছুতেই আটকাইয়া রাখিতে পারিতেন না। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ বাঙ্গালা দেশের ইংরাজী শিক্ষানবীশদিগকে একদিকে নাস্তিক এবং অন্যদিকে খৃষ্টিয়ান হইতে দেন নাই। এই কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আর ইহারই জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম বাঙ্গালার আধুনিক চিন্তার ও সাধনার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিবে। রাজা তাঁর সমসাময়িক সমাজে যে কাজটি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার যেমন মূল্য হয় না, মহর্ষির সমকালে তিনি যে কাজটি করিয়াছিলেন, তাহারও সেইরূপ মূল্য হয় না।

রাজা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, মহর্ষি তাহার ফল আহরণ করেন নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজও সে ফলের অধিকারী হয় নাই, ইহাও স্বীকার করি। রাজার যে বস্তু মহর্ষি বা ব্রাহ্মসমাজ পান নাই, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকে তাহা কতকটা পাইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যে চিন্তা ও সাধনার স্রোত বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া নানাদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দ্বারা যতটা রাজার

আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এখনও ততটা হইতে পারে নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু এ কথা ভুলিয়া গেলেও চলিবে না, মহর্ষি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজ, রাজার পথ পরিত্যাগ করিয়া যে কাজটি করিয়াছেন, সে কাজটি যদি না হইত, তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে রাজার কর্ম্মের যে ফল চারিদিকে ফলিতেছে, তাহাও কদাপি সম্ভব হইত না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অমানিশা

১

নৌকা চলিতেছিল। দাঁড়ের ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দে একটা সঙ্গীতের ছন্দ শুনিতেছিলাম। বিহারীকে বলিলাম, "আলো নিবাইয়া দাও।"

শিষ্ট বালকটির মত বিহারী আদেশ পালন করিয়া একধারে সরিয়া বসিল।

সমস্ত আকাশটা সেই অন্ধকারেও লক্ষ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছিল। গঙ্গার নিস্তরঙ্গ বক্ষে তাহার অনন্ত মূর্ত্তির ছবি যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। কেন? অমানিশার ভয়ে?

কোথাও একটি বাতাসের হিল্লোল পর্য্যন্ত নাই। জমাট অন্ধকারে তাহারাও কি আজ চলিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না? সারাদিন "অনাথ-আশ্রমের" কার্য্যপদ্ধতির বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া আমার মস্তিষ্কটা স্বাভাবিক অবস্থার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকৃতির এই তমোময় রূপ আমার হৃদয়কে অতি প্রচণ্ড-ভাবেই মুগ্ধ করিয়াছিল। বুঝিতেছিলাম, আমার সঙ্গী বেচারা বিহারী, শ্যামা মায়ের এই বিরাট্ অন্ধকার মূর্ত্তি দেখিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, তাহার চাঞ্চল্য প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার অধীরতার সাক্ষ্য দিতেছিল; কিন্তু কি করিব, বাতাস, আলো ও কোলাহল হইতে কিছুকাল আপনাকে দূরে না রাখিতে পারিলে আমি স্থির হইতে পারিব না।

মাঝি বলিল, "কর্ত্তা, আর কত দূর যাতি হবে?"

আমি নৌকার পাটাতনের উপর দেহ বিছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে বলিলাম, "যত দূর ইচ্ছা।"

বিহারী বলিল, "কিন্তু, চৌধুরী মশায়, ফিরতে অনেক রাত্রি হবে না?"

"তা হয় হউক।"

বুঝিলাম, সে তুষমনের পাল্লায় পড়িয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত। সে হয় ত মনে করিতেছিল, কলিকাতার ট্রাম, মোটর এবং ঘোড়ার গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দে যাহারা বৎসরের পনের আনা তিন পাই ভাগ কাটাইয়া দেয়, সৌদামিনীর উজ্জ্বল আলোকধারা নহিলে যাহাদের এক দিনও চলে না, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইলে যাহাদের প্রাণ হাপাইয়া উঠে, তাহারা কেমন করিয়া নৌকার উপর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে, নিঝুম স্তব্ধপ্রায় গঙ্গার বুকে অনির্দ্দেশ যাত্রায় আমোদ পায়?

আমাকে নীরব দেখিয়া বিহারী বোধ হয় আরও অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। সে বারকয়েক এ দিকে ও দিকে নড়িয়া-চড়িয়া শেষে বলিল, "আপনি ঘুমুলেন না কি?"

এমন বিরাট্ বিচিত্র শোভা যাহার দৃষ্টির সম্মুখে বিকসিত, সে কি কখনও ঘুমাইতে পারে?

আমি বলিলাম, "না, ঘুমাই নাই। কেন?"

"তা'দের সন্ধ্যার পর আস্‌বার কথা আছে, সেটা মনে আছে ত? এ দিকে দেরী হয়ে গেলে শেষে নানারকম অসুবিধায়—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "সারাদিন ত ঐ সকল কর্ম্মই করা গেছে, বাপু। এখন খানিকটা বিশ্রাম করা যাক্ না। তিন দিনের ছুটী ত এখনও আমার আছে।"

কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "আজ্ঞে, তা জানি। আপনারা আছেন বলেই আশ্রমটা এখনও কোন রকমে টিকে আছে। তবে কি না—তা থাক্। আর একটু যাওয়া যাক্।"

মূর্খ, অশিক্ষিত বিহারীকে এই জন্যই আমি এত শ্রদ্ধা করি। ভদ্রবংশে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সে লেখাপড়া শিখে নাই বটে, কিন্তু এমন কর্ম্মগতপ্রাণ, একনিষ্ঠ সেবক আর দেখি নাই।

অনাথ-আশ্রম তাহারই চেষ্টায় চলিতেছে। অনাথ, আতুরের সেবায় তাহার ক্লান্তি নাই। এই ব্রাহ্মণ যুবক যাহা করিতেছে, শিক্ষাভিমানী আমরা তাহার শতাংশের একভাগও ত কই পারি না!

কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সে এত অধীর যে, এতটুকু বিশ্রাম করিতেও সে রাজি নহে।

মাঝিকে বলিলাম, "নৌকা ফিরাও।"

২

পল্লী-সহরের নাতিপ্রশস্ত, তিমিরাবৃত পথ অতিবাহন করিয়া আমরা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন পল্লীকুটীরের আলোকমালা ক্রমেই নিবিয়া আসিতেছিল, পল্লীর কর্ম্মজীবনের উপর শান্তি ও অবসাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছিল। আশ্রমের সেবকগণ আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। তাহারা একসঙ্গে এত কথা বলিয়া গেল যে, প্রথমটা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে অন্যতম সেবক রমাপ্রসাদ আমাকে বুঝাইয়া দিল, আজ যাহাদের আসিবার কথা ছিল, ষ্টেশন হইতে আশ্রমে আসিবার পথে জমাদার তাহাদিগকে আটক করিয়াছে। সে নির্ব্বান্ধব মতিলাল প্রামাণিকের সৎকার করিয়া শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এই কথা শুনিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য কি? আমার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রত্যাশায় তাহারা কোন কর্ত্তব্যই নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই।

আর কিছু নাই থাক, মধ্যম রিপুটা আমার চিরকালই প্রবল। ভাল অথবা মন্দ

যাহাই হউক না কেন, এই দ্বিতীয় রিপুর তাড়নায় আমি অনেক প্রলোভনকে ধূলিমুষ্টির ন্যায় বর্জ্জন করিয়াছি, আবার নানারূপ বিপদ্‌কেও ডাকিয়া আনিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। দুর্জ্জয় ক্রোধ আমার চিত্তে গজ্জিয়া উঠিল। বিহারী ও রমাপ্রসাদকে বলিলাম, "তোমরা দারোগা বাবুকে গিয়া বল, মিঃ মিত্র, চৌধুরী মহাশয়কে আশ্রমের সকল বিবরণ জানিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। কা'ল প্রত্যূষে তিনি সহরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। আমাদের আশ্রমে যাহারা আসিতেছিল, জমাদার কেন তাহাদিগকে আটক করিয়াছে, তাহার কারণ তিনি জানিতে চাহেন। যেহেতু, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সব কথা জানাইতে পারিবেন।"

বিহারী ও রমাপ্রসাদ আদেশ পালন করিতে বিশেষ মজবুত। অত্যাচারের কথাতেই তাহারা রাগে ফুলিতেছিল। এখন আমার ইঙ্গিত পাইয়া তাহারা দ্রুত চলিয়া গেল।

আমি জানিতাম, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ, যাঁহাদের নাম করিলাম, আমি যে ঘনিষ্ঠ সূত্রে তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা মৃত্যুঞ্জয় দারোগা বিশেষরূপেই জানিতেন। আর 'চৌধুরী মহাশয়ের' সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নানারূপ পরিচয়ও ঘটিয়াছে। ক্ষীণদেহ 'চৌধুরী মহাশয়ের' প্রতাপ ও দুঃসাহসের অনেক পরিচয়ই তিনি পূর্ব্বে পাইয়াছেন। সুতরাং আমি আসিয়াছি, এ সংবাদ পাইলে কাজের সুবিধাই হইবে।

কিন্তু কেন? আমিঁ এ আশ্রমের কে? আমি পরিচালকও নহি, সেবকও নহি। সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার এমন বিশেষ কি যোগ আছে? কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মানুষ খুব বড় দরের একটা আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া থাকে। আমারও মনে এমনই একটা খেয়াল চাপিয়াছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাপুরুষগণের বাণী তখনও মনের সকল প্রান্তে জটলা করিয়া বেড়াইতেছিল; নিরন্ন দেশের অবস্থা, দেশবাসীর সামাজিক ও নৈতিক দুর্দ্দশা চারিদিক্ হইতেই নবজাগ্রত হৃদয়ে একটা প্রেরণা আনিয়া দিতেছিল। কিছু একটা মহৎ কার্য্য করিব, কোন ঐকটা মহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলসাধন করিব, এমনই একটা ভাবের স্রোত প্রাণের ভিতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময় "অনাথ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠার কথাটা জানিতে পারিয়াছিলাম। যাহারা নির্ব্বান্ধব, যাহারা উৎপীড়িত, যাহাদের কেহ নাই, এমনই অসহায় শিশু ও আতুরের জন্য যাঁহারা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াই মন নিরস্ত হয় না, নিজেকেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সেই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট রাখিতে সাধ যায়। অন্ততঃ সংসারে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া পড়ে নাই, টাকা, আনা, পাই, অথবা স্ত্রী-পুত্রের স্নেহপ্রেমে যাহাদের জীবন সার্থক হয় নাই, এমন উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি যুবকের মনে সেইরূপ ভাবের বন্যাই প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমিও সেই দলের একজন। সাংসারিক মানুষ হইয়া, নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইবার সুমতি কখনও হয় নাই। তাই পরোক্ষভাবে এই

সকল ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু সাধন-পথের যাহা প্রধান অবলম্বন সেবা, সেই ধর্ম্ম গ্রহণের মত সাহস থাকিলেও ইচ্ছা ছিল কি?

কিন্তু তথাপি আশ্রমের সেবকগণ আমাকে সত্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, তাহাদের যখন যাহা অভাব হইত, আমাকেই বিশেষ করিয়া জানাইত। আমাকে তাহাদের মধ্যে পাইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি আশ্রমের কেহ না হইলেও আমার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহারা অনেক কার্য্যই করিত। কোন পরামর্শ অথবা উৎসাহের প্রয়োজন হইলে আমার কাছেই ছুটিয়া আসিত। আমি কোনও লিখিত দায়িত্বভার স্কন্ধে না লইয়াও এই সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই বিজড়িত হইয়াছিলাম। আশ্রমের সেবকগণের সহিত একযোগে আমি যথাসাধ্য কাজও করিতাম। সেবকগণ আমার নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য এত আগ্রহান্বিত কেন? কে জানে!

৩

কোলাহল শুনিয়া বুঝিলাম, বিহারী ও রমাপ্রসাদ ফিরিয়া আসিয়াছে। দ্রুতপদে বিহারী আসিয়া আমাকে জানাইল, তাহারা আসিয়াছে। আমি বলিলাম, "জমাদার ছাড়িয়া দিল?"

"আজ্ঞে, তা না দিয়ে কি পারে? দারোগা বাবু বলিলেন, এ সকল ব্যাপারের তিনি কিছুই জানেন না। তার পর বাজারে গিয়ে তিনি এদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "বাজারে! সে কি, থানায় নিয়ে যায়নি?"

"না, বাজারে একটা বাড়ীতে দুজনকে বন্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিল। জমাদারের কুমতলব ছিল, বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, "তাদের নিয়ে এস, আমি একবার দেখ্‌তে চাই।"

বাস্তবিক ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। আশ্রয়হীনা পথভ্রষ্টা কোনও ইতর রমণীকে আশ্রমে স্থান দিবার কথাই শুনিয়াছিলাম। যেরূপ সংবাদ জানিয়াছিলাম ও বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে যে জমাদার পর্য্যন্ত লুব্ধভাবে এত বড় একটা বে-আইনী কাজ করিতে যাইবে, এতটা মনে করিতে পারি নাই!

বিহারী বলিল, "সারাদিন তাহারা অভুক্ত। চারটি আহারের পরই দু'জনকে আপনারই কাছে নিয়ে আস্‌বে। আজ যখন আপনি উপস্থিত আছেন, তখন এক্‌রারের কাজটা আপনিই দয়া ক'রে সেরে ফেলুন।"

এক্‌রার?—হাঁ, "অনাথ-আশ্রমের" প্রচলিত বিধান অনুসারে, যাহারা আশ্রয়প্রার্থী, তাহাদিগের ব্যক্তিগত গোপন কথাটি সরলভাবে সেবকদিগের কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে হয়। সমস্ত শুনিয়া যদি আশ্রয়দানের উপযুক্ত বলিয়া সেবকেরা বিবেচনা করেন,

তবেই তাহাদিগকে আশ্রমভুক্ত করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা দয়া ও আশ্রয়ের উপযুক্ত, তাহারা ছাড়া অন্যকে এখানে আশ্রয় দিয়া অন্যায় বা গোপন পাপের প্রশ্রয় দেওয়া পরিচালকবর্গের অভিপ্রেত নহে।

উদ্দেশ্য সাধু ; কিন্তু মানব-সমাজ সমস্ত সাধু উদ্দেশ্যের সকল ধারা সকল সময়ে অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। অনাথ-আশ্রম সম্বন্ধে লোকের মনে একটা বিরুদ্ধ মতও যে প্রবল হইয়া উঠে নাই, তাহাও ত বলা যায় না। আশ্রমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান ছিল, তাঁহাদের অনেকেই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, এমন একটা সাধু উদ্দেশ্যমূলক প্রতি-ষ্ঠান যে, অনাচারের ও অসাধু কর্ম্মের নেপথ্য-ভূমিতে পরিণত হইতেছে না, কে তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারে ?

এই সকল বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ জানিবার জন্যই এ যাত্রা আমি এখানে আসিয়া-ছিলাম। যাহা জানিয়াছিলাম, তাহাতে আমার সন্দেহ মিটিয়াছিল। কিন্তু অনেকের মর্ম্মস্থলের অতিশয় বেদনাপূর্ণ অথচ লজ্জাজনক আত্মপ্রকাশ শুনিবার বা জানিবার মত অবস্থা পূর্ব্বে কয়েকবার ঘটিয়াছে। সুতরাং সেজন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম।

৪

বিহারী বলিল, "চৌধুরী ম'শায়, এইবার তাদের নিয়ে আসি ?"

সতরঞ্চের উপর আড় হইয়া অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার অর্থ ও সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। তমোময়ী প্রকৃতি স্তব্ধভাবে কান পাতিয়া ও কি শুনিতেছে ? মর্ত্ত্য ও শূন্যব্যাপী ঝিল্লীর অশ্রান্ত সঙ্গীতধ্বনি ?

বিহারীর প্রশ্ন আমার চিন্তাসূত্রকে ছিঁড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া তাহাকে অনুমতি দিলাম।

হারিকেন্ লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম, বিহারী আশ্রমের খাতাপত্র, কালি-কলম পার্শ্বেই রাখিয়া গিয়াছে।

বিচারকের ন্যায় কঠিন হইয়া বসিলাম।

দরজা খুলিয়া গেল। একটি তরুণ যুবক কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। তাহার সর্ব্বশরীরে ভদ্রবংশের যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিলাম। যুবক সসম্ভ্রমে আমায় অভিবাদন করিল। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি কে ?"

দরজার কাছেই বিহারী দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "যিনি এসেছেন, উনি তাঁর ভাই।"

আমার বিস্ময় চরম সীমায় পঁহুছিল। কিন্তু গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আপনারই সহোদরা এখানে আশ্রয় লইতে চান ?"

যুবকের সুন্দর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, অপমান এবং নিরুপায়জনিত নৈরাশ্যের ম্লান রেখা তাহার আননে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। লজ্জার অরুণরাগে তাহা যেন আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কিন্তু মনের সমস্ত কোমলতাকে সংযত করিয়া অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে বলিলাম, "মনে হইতেছে, আপনারা ভদ্র গৃহস্থ। অনাথ-আশ্রম আপনাদের মত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্ষমা করিবেন, আমরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিব না। ভ্রান্ত ধারণার জন্যই সেবক-সম্প্রদায় আপনাদিগকে এখানে আসিতে লিখিয়াছিলেন।"

যুবক অত্যন্ত নিরুপায়ভাবে আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষা করুন, আমাদের মান-ইজ্জত বাঁচান। বড় দায়ে পড়িয়াই আপনাদের শরণ লইয়াছি। আপনারা ত্যাগ করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

তাহার কাতরোক্তি আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। সংসারের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছিলাম, কার্য্যোদ্ধারের জন্য অনেকেই চমৎকার অভিনয় করিতে পারে। ইহাতে যদি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই, উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

বিচারকের ন্যায় অবিচলিতভাবে বলিলাম, "আচ্ছা, আগে আপনার কাছে ব্যাপারটি শোনা যাক্, যদি অসঙ্কোচে সমস্ত সত্যকথা বলেন, আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, তখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি, এখানে আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে কি না।"

তরুণ যুবক লজ্জা-কম্পিত-কণ্ঠে যাহা বলিল, তাহাতে এইটুকু বুঝিলাম, সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে। অবস্থা তাহাদের ভাল নয়। মাতা নাই, পিতা আছেন। উপার্জ্জনের পথ বিশেষ কিছুই নাই। কোন রকমে দিনপাত হয়। তাহার সহোদরা বিবাহিতা, স্বামী কুক্রিয়াসক্ত। কোনও পাষণ্ড প্রতারকের চক্রান্তে পড়িয়া সেই রমণী আজ এইরূপ ঘৃণিত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যদি এখানে আশ্রয়লাভ না ঘটে, তাহা হইলে সমস্ত প্রকাশ পাইলে সমাজে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। এ অবস্থায় তাহারা দয়ার ভিখারী।

সেই চির-পুরাতন কাহিনী! নরনারী খেয়াল এবং অনাচারের পথে অসংযতভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে এমনই একটা অবস্থায় উপনীত হয়। তখন লোকলজ্জা ও গঞ্জনার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। শুধু এই সকল কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত, বাসনাসক্ত নরনারীর অপকীর্ত্তির আশ্রয়স্থলের জন্য অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহারা সমাজ ও মানব-নীতির চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের জন্য এখানে আসিতে চাহে, এ আশ্রম তাহাদিগকে পরিহার করিবে। নহিলে দশের কাছে, দেশের নিকট তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবার কিছু থাকিবে কি?

বিহারীকে বলিলাম, "আজ রাত্রিতে ইহাদের এখানে থাকা সম্বন্ধে কোন আপত্তি

নাই। কিন্তু কা'ল চলিয়া যাইতে হইবে। আশ্রমের প্রতিপত্তি ও সুনামের জন্য আমরা ইহাঁর ভগিনী অথবা অনুরূপ অবস্থার কাহাকেও এখানে আশ্রয় দিতে পারি না।"

যুবকের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "দোহাই আপনার! আমাদের জাত, মান সব ডুবিতে বসিয়াছে। দয়া করিয়া রক্ষা করুন।"

কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে দ্বারপার্শ্বে চুড়ীর মৃদু আওয়াজ শুনিলাম। পর-মুহূর্ত্তেই শঙ্কা ও লজ্জায় বেপথুমানা এক নারী-মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে তাহার সমস্ত মুখখানি দেখিতে পাইলাম। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

জমাদার কেন যে ইহাকে আটক করিয়াছিল, তাহার কারণ এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহার দেহে রূপ ও যৌবনের যে ললিত-লাবণ্যের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতে-ছিল, তাহাতে অনেক সাধুর মন টলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। জমাদার ত অতি তুচ্ছ।

সঙ্কোচ ও লজ্জার সমস্ত বাধা যেন অতিকষ্টে সরাইয়া রাখিয়া রমণী ক্ষীণ, মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমায় রক্ষা করুন। বড় অনাথা, বড়ই বিপন্ন আমি। আপনার ছোট বোন মনে ক'রে আমায় আশ্রয় দিন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার জন্য আমার নিরপরাধ ছোট ভাইটির সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, আমার বাবার মুখে চূণ-কালি পড়বে—বংশে যে দাগ প'ড়ে যাবে, বহু জন্মে তা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। আশ্রয় দিন, রক্ষা করুন।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

সংসারে যাহারা কর্ত্তব্যপালন করিবার জন্য উৎসুক হয়, তাদের পক্ষে অনেক সময় কঠোর না হইলে ত চলে না। এ রকম অনেক কাতরোক্তি আমার শোনা অভ্যাস ছিল। সুতরাং মন একটু বিচলিত হইলেও আবার আত্মস্থ হইলাম।

ধীরে ধীরে বলিলাম, "আচ্ছা, আগে সমস্ত অবস্থাটা শোনা যাক্; যদি অসঙ্কোচে সমস্ত সত্যকথা প্রকাশ করেন, তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে। নামধাম ত বলিতেই হইবে, কারণ, আশ্রমের নিয়ম তাহাই। ঘটনার সত্যাসত্য বুঝিয়া পরে ব্যবস্থা হইবে।"

যুবক বলিলেন, "আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য, জানিয়া লউন। আমার দিদি আপনাদের সমস্ত সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত আছেন।"

৫

চাপা দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুম্লান কাতর দৃষ্টি, লজ্জা ও সঙ্কোচনম্র অর্দ্ধস্ফুট ভাষা প্রভৃতির সমবায়ে যে কাহিনী জানিতে পারিলাম, তাহার মধ্যে কতটুকুই বা সত্য, কতটুকুই বা অতিরঞ্জন আছে, তাহা যিনি সকলের অন্তরে নিত্য বিরাজিত, তিনি ছাড়া আর অন্যে কে

বলিতে পারিবে ? কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহা নিত্যঘটনা না হইলেও সমাজে নিতান্ত দুর্লভ নহে, তাহা এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে আজ হলপ করিয়া বলিতে স্বীকৃত আছি।

দারিদ্র্য মানুষকে কত শীঘ্র চূর্ণ করিয়া ফেলে, হিমালয়ের উচ্চ চূড়া হইতে কত অনায়াসে অতলস্পর্শ গহ্বরের অন্ধকার গর্ভে নিক্ষেপ করে, তাহা ইতিহাস পাঠ না করিয়াও লোক অনায়াসে শত-সহস্র দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারে।

মনোরমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু স্বামী দূর-প্রবাসে নিজের খেয়াল ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা চড়াইয়া নিরুদ্বেগে দিনযাপন করিতেছিল। আশ্রয়হীনা সুন্দরী পত্নীকে সে দরিদ্র শ্বশুরের স্কন্ধে ভারের ন্যায়ই চাপাইয়া গিয়াছিল। বিপত্নীক বৃদ্ধ, স্বামিপরিত্যক্তা কন্যাকে কাছেই রাখিয়াছিল। পুত্র কায়ক্লেশে কলিকাতায় কোন কলেজে বি·এ পড়িতেছিল। বৃদ্ধবয়সে পল্লী-সহরে একখানিমাত্র বাড়ী ভরসা। তাহার একাংশে পিতা ও কন্যা। অপরার্দ্ধ কোনও চাকুরীজীবী ভাড়া লইয়াছিল। সেও সস্ত্রীক সেখানে থাকিত। ভদ্রগৃহস্থ ভাবিয়া বৃদ্ধ যাহাকে বাড়ী ভাড়া দিয়াছিল, স্বামিপরিত্যক্তা সুন্দরী যুবতীর সৌন্দর্য্য তাহাকে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না। মানব-হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে তাহার সমস্ত লীলার বিকাশ হইয়া শেষে বাহ্য-ব্যবহারেও ক্রমে ক্রমে নানাচ্ছলে যখন আত্মপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিল, তখন নিরুপায় মনোরমা পিতা ও ভ্রাতাকে সে সম্বন্ধে আভাষ দিল। ভাড়াটিয়া, গৃহস্বামীর নিকট ইঙ্গিত পাইয়া সতর্ক হইল। বৃদ্ধ তাহাকে উঠাইয়া দিতে উদ্যতও হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের অনধিকারচর্চ্চায় লজ্জিত হইয়া অপরাধী যখন ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবার অঙ্গীকার করিল এবং প্রকাশ্যে সংযত ভদ্রব্যবহার অবলম্বন করিল, তখন একমাত্র পনের টাকা ভাড়ার মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে তাড়াইবার কল্পনা পরিত্যক্ত হইল।

কিছুকাল পরে ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকের সন্তানসম্ভবা পত্নী প্রসবাগারে আশ্রয় লইলেন। মনোরমার সহিত এই নারীর সদ্ভাব ক্রমেই বাড়িয়াছিল। আত্মীয়হীনা প্রসূতিকে নানাপ্রকারে সেবা করিয়া সে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিল।

আষাঢ়ের কোন অপরাহ্ণে মনোরমা প্রসূতির নিকট জানিতে পারিল যে, সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে তাহার স্বামী সেই দিন মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তাহার দুই এক দিন বিলম্ব হইবে। সূতিকাগারে ধাত্রী থাকিবে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুত্র ও তিন বৎসরের কন্যা, এই দুইটিকে লইয়াই গোল। তবে মনোরমা যদি অনুগ্রহ করিয়া রাত্রিকালে তাহাদের শয়নগৃহে সন্তান দুইটির কাছে শুইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাদায় হইতে প্রসূতি উদ্ধার পায়। মনোরমার তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। সে উৎসাহ সহকারে এই সামান্য উপকার করিতে রাজি হইল।

সারাদিন গৃহকর্ম্মের পর বৃদ্ধ পিতার পরিচর্য্যা শেষ হইলে রাত্রি প্রায় দশটার

সময় মনোরমা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিল। ঘরের মধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল। সে দেখিল, বালক ও বালিকা বর্ষার রাত্রিতে অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রসূতির কক্ষদ্বারে গিয়া তাহার সংবাদ লইয়া মনোরমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিল।

তার পর ?- লজ্জায়, সঙ্কোচে, কুণ্ঠায়, ঘৃণায় রমণীর মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা আমার দৃষ্টিই শুধু বুঝিতে পারিল। নত দৃষ্টি, ম্লান মুখের আকুঞ্চন-প্রসারণে যাহা ব্যক্ত হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বুঝিলাম, গৃহের মধ্যে, খাটের নীচে ভণ্ড প্রতারক আত্মগোপন করিয়া ছিল। আকাশে ঘন-বর্ষণের সঙ্গে মেঘের গুরুগর্জ্জন মিলিয়া যে শব্দ অবিশ্রান্ত চলিতেছিল, তাহাতে নিদ্রিতা মনোরমার সহসা নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল না। তার পর অকস্মাৎ অন্যের স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে. সে আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন মনে করিয়া চীৎকার করিতে গেল। বর্ষার শব্দে তাহার ভীতিব্যাকুল অস্ফুট শব্দ কোথায় মিলাইয়া গেল। তার পর যখন লুব্ধ লম্পট তাহাকে বুঝাইয়া দিল, চীৎকার ও গোলযোগের পরিণাম তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক ও ভীষণ হইবে, তখন স্বামি-পরিত্যক্তা দুর্ব্বলা নারী নিজের অসামর্থ্যের কথা মনে করিয়া এমনই বিমূঢ়া হইল যে, সেই অবকাশে অধঃপতনের পথ আপনা হইতেই প্রশস্ত হইয়া গেল। নিরর্থক লজ্জাই ভীরু রমণীর পতনের প্রথম সোপান।

তার পর ?—তার পর, পিচ্ছিল পথে একবার পদস্খলন হইলে, একবার কর্দ্দমে লুণ্ঠিত-দেহ হইলে তখন—

হাঁ, সে কথা কে অস্বীকার করিবে ? খানায় পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলে, তাহার হাত ধরিয়া তুলিবার যদি কেহ না থাকে, তাহা হইলে কোথায় তাহার পতনের সমাপ্তি ? পরিণাম তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে ?

* * * *

অমানিশার অন্ধকার বাহিরে তেমনই স্তব্ধভাবে, নিবিড় আলিঙ্গনে প্রকৃতিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এই নারীর আত্ম-কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইতে লাগিল, বাহিরের নিবিড় তিমিরপুঞ্জ ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার দেহ এবং ক্রমে আমার অন্তরতম প্রদেশ দৃঢ় আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিতেছে। নিশ্বাস যেন সেই চাপে বন্ধ হইয়া আসিতেছে !

কেন ? কেন ?—হে বিরাট্ ! তুমি যে মূর্ত্তিতে আজ আবির্ভূত, এই নিখিল বিশ্বের কয়জন তাহার আলিঙ্গনে পিষ্ট হয় নাই ? সংসারে, সমাজে তোমারই অনন্ত লীলা

কুটীরে ও প্রাসাদে প্রতি নিশীথে চলিয়াছে। তোমার এই ভীমকান্ত রূপের স্রোত বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে কত ভাবেই না বহিয়া চলিয়াছে!

নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। কি স্পর্দ্ধা আমার, এই নারীর মর্ম্মের গোপনতম বিষয়টি লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ও বিচার করিবার অধিকার কে আমাকে দিয়াছে? বিচার?—কিসের বিচার? কাহার বিচার? অধঃপতন!—কাহার অধঃপতন? এই নারীর, না সমগ্র মানব-সমাজের? এই দুর্ব্বলতা, এই মোহ, তাহার এই পরিণাম, ইহার জন্য কে দায়ী? অসংযতচরিত্র নর-নারী? অবশ্য, মানব-নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে তাহাদের অপরাধ গুরুতর, অমার্জ্জনীয়। কিন্তু ইহার জন্য আর কেহই কি দায়ী নহে? সমাজের, মানবজাতির কর্ত্তব্য কি শুধু দণ্ডদানেই সমাপ্ত?

মনে পড়িল, বাঙ্গালায় পুরুষসিংহের সেই ভীম গর্জ্জন। "আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। পৃথিবীর সামান্য একটি কৃমি-কীট পর্য্যন্ত যতক্ষণ মুক্তি না পাইবে, ততক্ষণ স্বর্গের সুখভোগ আমি চাহি না। তাহাদের সহিত লক্ষ জন্ম আমি নরকে যাইতে চাই।"

কিন্তু, কিন্তু—

চমকিয়া সম্মুখে চাহিলাম। আমার পদতলে সুন্দরী রমণী লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমার বড় ভাই,—বাপের মতন। পতিতাকে আশ্রয় দিয়ে লজ্জা, লাঞ্ছনা এবং ভীষণ পরিণাম থেকে তাকে রক্ষা করুন। এখানে আশ্রয় না পেলে, সব প্রকাশ হবে, তখন সংসারে দাঁড়াবার জায়গা আমার থাক্‌বে না। উঃ—তখন কি কর্‌বো, কি হবে!"

বিহারীর দিকে চাহিয়া দেখি, বস্ত্রাঞ্চলে সে নয়ন মার্জ্জনা করিতেছে। অশ্রুনিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিল, "চৌধুরী ম'শায়—"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিলাম, "বিহারি! ইঁহাকে ভিতরের খণ্ডে নিয়ে যাও। রসিকের মাকে ব'লে দিও, এঁর সকল রকমের সুবিধার জন্য সেই দায়ী।"

মনোরমার ভ্রাতা দুই হস্তে আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া গভীর কৃতজ্ঞতাভরে বলিল, "একটা দরিদ্র পরিবারের মান-ইজ্জত আপনি রক্ষা কর্‌লেন। ভগবান্—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আজ আশ্রমেই থাকুন। আপনার ভগিনীর সম্বন্ধে সেবকেরাই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। বিহারি, চল, আমি এখন ঘুমোবো।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বিরাট্ অমানিশীথিনী যেন তেমনই স্তব্ধভাবে উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে! এ অমানিশার ঘোর কখনও কাটিবে কি?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সালোমে

৫

সালোমে স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন। রাজকুমারী একবার যাহা ধরিয়াছেন, তাহা কোন মতেই ছাড়িবেন না। "ইওকানানের মস্তক দাও" বলিয়া বারংবার হেরোদকে উত্যক্ত করিতে থাকিলেন। হেরোদের মনে হইল, সালোমে বোধ হয়, তাঁহারই অন্যায় আচরণের শাস্তি দিবার জন্য এইরূপ জেদ করিতেছে। আজ সারা সন্ধ্যা তিনি শুধু তাহারই দিকে তাকাইয়া ছিলেন। সালোমের সৌন্দর্য্যে তাঁহার ভীষণ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। আজ সেই জন্যই বোধ হয়, সালোমের এই প্রতিশোধ। হেরোদ নিজেই 'ঘাট' স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর এমন কাজ করিব না—কি মানুষ, কি জড়বস্তু, কোন কিছুরই দিকে এমন করিয়া চাহিব না। দর্পণের দিকেও বোধ হয়, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকিতে নাই, কারণ, দর্পণে যাহা দেখা যায়, তাহা তো 'মুখোসে'র ন্যায় আবরণ মাত্র।" বলিতে বলিতে রাজার হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, —"বড় তৃষ্ণা—গলা শুকাইয়া গিয়াছে—শীঘ্র পানীয় জল লইয়া আইস।" কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইতে না হইতেই হেরোদ বলিতে লাগিলেন,—"সালোমে, আর রাগ করিয়া থাকিও না, আইস, আমাদিগের ঝগড়া মিটাইয়া ফেলি। কি যেন বলিতেছিলাম—হাঁ, মনে পড়িয়াছে। সালোমে, আমার কাছে সরিয়া আইস, হয় তো, আমার সকল কথা শুনিতে পাও নাই, তাই বলিতেছি, সরিয়া আসিয়া শুন। জান তো, আমার কত সুন্দর সুন্দর শ্বেত-ময়ূর (১) আছে, বাগানের মেহেদি ও সাইপ্রেস্ (Cypress) গাছের মাঝে মাঝে সেগুলি

---

(১) প্রাচ্যখণ্ডের রাজারাজড়াদিগের চিত্র-শালিকায় বিচিত্র পশু-পক্ষি-পালনের সখ বড় অল্প দিনের নহে। ভারতে সম্ভবতঃ ইহা হিন্দু-যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শুক্রনীতিকার যেখানে রাজধানী নির্ম্মিত হইবে, সেই স্থানটির মনোহারিত্ব (attraction) বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশু ও অন্যান্য জন্তুদিগের সহিত পক্ষী প্রভৃতি প্রতিপালনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। (B. K. Sarkar's Positive Back ground of Hindu sociology P. 250) মোগল-সম্রাট্‌গণও নূতন জানোয়ার—আজব চিড়িয়া পুষিতে ভালবাসিতেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ সেগুলির তস্‌বীর আঁকাইয়া রাখিতেন (Percy Brown's Indian painting p. 73)। শুনিয়াছি, কিছু কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার নবাব নাজিমদিগের প্রতিষ্ঠিত গৃহ-চিত্রশালায় cassowary প্রভৃতি পক্ষীর সহিত শ্বেত-ময়ূরও পালিত হইত।

আনন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহাদের পায়ের রং বেগুনী, ঠোঁটগুলি সোনালী। সেই সোনালী ঠোঁট দিয়া তাহারা সোনার বরণ শস্য খুঁটিয়া খায়। তাহাদের কেকারবে বর্ষার বারিপাত আরম্ভ হয়। (১) তাহারা পেখম ধরিলে আকাশে চাঁদ উঠে। ইহারা যুগবদ্ধ হইয়া কাল মেহেদি ও সাইপ্রেস্-কুঞ্জের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়—কখনও বা বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া যায়। স্বচ্ছ সরসীর চারিপার্শ্বে বা শ্যাম-শস্পাচ্ছাদিত তৃণভূমির উপর ইহারা ঘুমাইয়া পড়ে। প্রত্যেকের এক একটি করিয়া পরিচারক। এমন অপূর্ব্ব পক্ষী সারা জগৎ খুঁজিলেও মিলে না; অপর কোনও রাজার ভবনে এমন কলাপী পাইবে না, এত সুন্দর ময়ূর সীজারেরও নাই। আমি তোমাকে পঞ্চাশটি এইরূপ ময়ূর উপহার দিব। ইহারা সর্ব্বত্রই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এই সকল সুন্দর বিহগে পরিবৃত হইয়া তুমি শুভ্র অভ্ররাশি-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভান্বিতা হইবে। আমার একশত শিখী আছে, না হয় তোমাকে সবগুলিই দিব। শুধু আমাকে শপথ হইতে রেহাই দাও।"

সৌখীন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া, খোসামোদ করিয়া যাহা হয় না, অনেক সময় কোন আজগুবি জিনিস জোগাইয়া সখ মিটাইবার আশ্বাস দিলে সহজেই তাহা হাসিল করা যায়। এই ভাবিয়াই হেরোদ বোধ হয়, এতক্ষণ সালোমেকে নূতন রকম প্রলোভন দেখাইয়া তাহার প্রার্থনা প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া পুনরায় গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি মধুপূর্ণ পাত্র এক নিঃশ্বাসে শূন্য করিয়া ফেলিলেন। সালোমের শুধু সেই এক ধুয়া—"ইওকানানের মুণ্ড আনাইয়া দিন।" হেরোদিয়ারও স্পর্দ্ধা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ময়ূর দিয়া

---

(১) বর্ষার মেঘ ও কেকারব সম্বন্ধে সংস্কৃত-সাহিত্যেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

"শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবনে গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥"

পূর্ব্বমেঘ—২৩

"পথে যেতে যেতে যবে শুক্লাপাঙ্গ কেকারবে
সজল-নয়নে তব অভ্যর্থনা করিবে;
বিশেষ উদ্যোগ কর শীঘ্র যাতে যেতে পার।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

(মেঘদূত—শ্রীযুক্ত এককড়ি দে-কৃত বঙ্গানুবাদ।)

শোধবোধ! এ সব কি হাসি-তামাসার কাণ্ড না কি?" ক্রুদ্ধ হেরোদ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "চুপ কর তুমি; আর তো কাজ নাই; শিখিয়াছ কেবল চীৎকার করিতে। সর্ব্বক্ষণই হিংস্র শ্বাপদের মত গর্জ্জন করিতেছ। এমন করিয়া কি চেঁচামেচি করিতে আছে? থাম তুমি বলিতেছি, আর বিরক্ত করিও না।" রাণীকে থামাইয়া হেরোদ আবার সালোমেকে লইয়া পড়িলেন দুই জনকে একসঙ্গে সামাল দেওয়া বড় দায়। হেরোদ সন্দেহবাদী হইলেও ঐশ্বরিক শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসহীন নহেন। এ যাবৎ পুরাদস্তুর নাস্তিক হইয়া উঠিতে পারেন নাই। অলৌকিক ঘটনা সম্ভবতঃ ঘটিতেও পারে, ইহাই তাঁহার মনের ভাব। তাই হেরোদ দ্রেত্রার্ক সালোমেকে বলিলেন, "তুমি যে কি করিতে বসিয়াছ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। ও ব্যক্তি হয় তো ভগবানেরই প্রেরিত—আমার তো স্থির-বিশ্বাস যে, ও ঈশ্বর-জানিত লোক—তাঁহারই বারতা বহিয়া আসিয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ—ভগবৎস্পর্শে পবিত্র। কি ভীষণ বাণীই ভগবান্ ইহার মুখে অর্পণ করিয়াছেন! প্রাসাদে হউক, মরুতে হউক, জগৎপাতা কখনও ইহাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন না—ইহাই তো অন্ততঃ সম্ভব বলিয়া মনে হয়। লোকে হয় তো না জানিতে পারে, কিন্তু ভগবান্ বোধ হয়, ইহাঁরই পক্ষপাতী এবং ইহাঁতেই সম্মিলিত, তাই বলিতেছিলাম, ইনি মরিয়া গেলে হয় তো কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে। আর সে অমঙ্গল, আমি ছাড়া ঘটিবেই বা কাহার? মনে আছে তো, এখানে আসিবার সময় রক্তে পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া মাথার উপর দুইটা বিশাল পাখার ঝাপ্-টার শব্দ শুনিয়াছি। এ সব বড়ই অলক্ষণের কথা। এমনি আরও কত কি অমঙ্গলের সূচনা নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু সেগুলি আমার নজরে পড়ে নাই। সালোমে! আমার কোন অমঙ্গল ঘটে, এই কি তোমার ইচ্ছা? তা যখন নয়, তখন আমার কথা একবার ভাল করিয়া অনুধাবন কর।"

সালোমে যে বুলি ধরিয়াছে, তাহা কোন মতেই ছাড়িল না—এত বক্তৃতা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। হেরোদ বুঝিলেন যে, সালোমের মন অস্থির; সেই জন্য তাঁহার কথাগুলি কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে না। স্ত্রীজাতির অলঙ্কার-স্পৃহা চিরকালই বলবতী; এ প্রসঙ্গে তরুণীর মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; তাই পুণ্যাত্মার রক্ত-পিপাসু এই দয়ালেশশূন্যা নারীকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে অলঙ্কারের প্রলোভন দেখা-ইয়া বলিলেন, "শুন সালোমে! আমার অনেকগুলি রত্নাভরণ আছে। তাহার সংবাদ তোমার মাতাও অবগত নহেন। এই সব বিচিত্র অলঙ্কার তিনি কখনও চোখেও দেখেন নাই। চারি'নর' একগাছা মুক্তার হার আছে-হার ত নয়, যেন রূপালী কিরণে একসারি চাঁদ গাঁথা; যেন পঞ্চাশ পঞ্চাশটি আকাশের চাঁদ সোনার তারে আবদ্ধ রহিয়াছে। কোন এক দেশের রাজরাণী তাঁহার হস্তিদন্তনিভ শুভ্র বক্ষে এই হার ধারণ করিতেন। এ হার যখন কণ্ঠে ধারণ করিবে, তখন তুমিও সেই রাণীর ন্যায় অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্য-সুষমায় বিভূষিতা হইবে।” এই বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া হেরোদরাজা তাঁহার বিভিন্ন-জাতীয়রত্নাদির লম্বা ফর্দ্দ দিতে বসিয়া গেলেন। “দুই প্রকার—রাজাবর্ত্ত বা ধূম্রমণি (·methyst)(১); তাহার কতকগুলি সুরার ন্যায় কৃষ্ণাভ আর কতকগুলি জলমিশ্রিত দ্রাক্ষারসের ন্যায় রক্তাভ। পুষ্পরাগমণিগুলিও তিন প্রকারের ;—(২) ব্যাঘ্র-চক্ষুর ন্যায় পীত, কপোত-চক্ষুর ন্যায় গোলাপী ও মার্জ্জারচক্ষুর ন্যায় হরিতাভ। গোদন্তমণির জ্যোতিঃশিখা বড়ই শীতল। ইহা মানব-মন দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ঘনান্ধকারে অভিভূত করিয়া ফেলে। আর আছে শ্বেত ‘পালক’ বা অনিক্স (onyx) মণি। সেগুলি যেন মরামানুষের চোখের পুতুলের মত। চন্দ্রকান্তমণি (Seleniti৭) সমূহের চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে—রবিদর্শনে অমনি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রনীল (Sapphire) মণির যেন ঠিক নীল ফুলের মত রং, আকারে প্রায় এক একটি পাখীর ডিমের মত বড়। সদাচঞ্চল সমুদ্রের নীলিমা যেন ইহার ভিতর চিরতরে আবদ্ধ—চন্দ্রের আবির্ভাব-তিরোভাবে এ রত্ন-নিঃসৃত দীপ্তিতরঙ্গের কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয় না। আর কত নাম করিব—পীতমরকত (beryl), (১) পুত্তিকা (Chrysolith), (২) ক্রিসোপ্রাজ (chrysoprase) লসুনিয়া (?), শ্বেত-সীস বা গন্ধর্ব্বমণি (ch'cedon), (৩) শঙ্কুলমণি (Hyacinta মতান্তরে গোমেদ), (৪) পালকমণিসংযুক্ত (৫)* রক্তপিঙ্গল রুধিরাখ্য (Sardo yx)—এই সব বিবিধ মণি-রত্ন সমস্তই তোমাকে— আর আর যাহা কিছু আছে, তাহাও দিব† এই সবেমাত্র

(১) অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার রত্নপরীক্ষাগ্রন্থে দুই প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট (Anethysf) মণির উল্লেখ করিয়াছেন ;—নীলগন্ধি বা নীলবর্ণ টিটিভ (পৃঃ ৫৪,৭৬) (oriental emethyst) ; ঈষৎ রক্তনীল রাজাবর্ত্ত (auethyst) পৃঃ ১১৫।

(২) রত্নবিষয়ক প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতেও তিন চারি বর্ণের পুষ্পরাগমণির উল্লেখ দেখা যায়। সাধারণ পুষ্পরাগ বা পোখরাজের তরল পীতবর্ণ। কুরুণ্টক ও কাষায়ক শ্রেণীর পুষ্পরাগগুলি রক্তাভ। রত্নশাস্ত্রাদিতে কেবল বৈদূর্য্য (beryl) মণিই মার্জ্জারচক্ষুর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হরিতাভ পুষ্পরাগের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু সোমালক নামে অভিহিত নীলাভ পুষ্পরাগের বর্ণনা দেখা যায় (ডাঃ রামদাস সেন প্রণীত রত্নরহস্য, ১০৯-১১০ পৃঃ)। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় ‘আহরিত’ পুষ্পরাগ ও aquamarine অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (রত্নপরীক্ষা পৃঃ ৯৫)।

* (১), (২), (৩), (৪), (৫) চিহ্নিত পরিভাষা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের রত্নপরীক্ষা হইতে গৃহীত।

† রত্নাদির ঈদৃশ গুণাদি সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও নানাবিধ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল ; সার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের মণিমালা গ্রন্থে গোমেদ রত্ন এইরূপ delusion creating বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজা আমাকে শুকপাখীর পালকে নির্ম্মিত একখানি ব্যজনী পাঠাইয়া দিয়াছেন, নুমিডিয়ার রাজা উটপাখীর পাখায় নির্ম্মিত অঙ্গচ্ছদ উপহার দিয়াছেন। আমার একখণ্ড স্ফটিক আছে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের দেখিতে নাই। তরুণবয়স্ক যুবকেরাও কঠোর নিষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ বেত্রাঘাতে নিজ অঙ্গ জর্জ্জরিত না করিয়া, তাহা নিরীক্ষণ করিতে পায় না। ঝিনুক বসান একটি সুন্দর কৌটার ভিতর আমার তিন খণ্ড ঈষন্নীলিমাযুক্ত হরিদ্বর্ণের তুরস্ক-মণি বা পারস্যদেশীয় ফিরোজা (turquoise) আছে। এগুলির বড়ই আশ্চর্য্য গুণ, ললাটে ধারণ করিলে অবিদ্যমান বস্তুনিচয় কল্পনাপথে আবির্ভূত হয় (On peut ima_iner des choses qui nexistent pas) আর হস্তে ধারণ করিলে স্ত্রীগণ সন্তান-সম্ভাবিতা হয় না।"

হেরোদ বলিতে লাগিলেন, "এ সকল রত্ন মহামূল্য—মহামূল্য কেন, অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহাতেও ফর্দ্দ শেষ হয় নাই—এখনও অনেক বাকী। আবলুস কাঠের পেটিকামধ্যে কারুবার বা তৃণমণি-(Amber) নির্ম্মিত দুইটি পানপাত্র রহিয়াছে—দেখিতে যেন দুইটি সোনার আপেল-ফল। যদি কোনও শত্রু বিষ-প্রয়োগের জন্য ইহাতে বিষ-মিশ্রিত পানীয় ঢলিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহার সোনার মত বর্ণ রূপার ন্যায় শাদা হইয়া যাইবে। তৃণমণি-খচিত আর একটি আধারে এক জোড়া কাচ-নির্ম্মিত পাদুকা রহিয়াছে। এ ছাড়া সীরিয়াদেশীয় অঙ্গাবরণ,ইউফ্রেতিস সহর হইতে আনীত পদ্মরাগ ও গাঢ় হরিৎ যশম্ বা পীলু (gade), প্রস্তর-খচিত কঙ্কণ প্রভৃতি সবই তোষাখানায় রহিয়াছে—শুধু সালোমের চাহিতে যা বিলম্ব। সালোমে চাহিলে সবই মিলিবে ; শুধু মিলিবে না একটি জিনিস—সেই একটি লোকের জীবনদণ্ডের আদেশ। শুধু এইটি ছাড়িয়া দিলে হেরোদ নৃপতি সালোমেকে প্রধান পুরোহিতের প্রাবার—এমন কি, ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র আচ্ছাদনবস্ত্র পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। (১)

---

(১) এই একটি অনুচ্ছেদে ওয়াইল্ড (Wilde) প্রাচীনদিগের মধ্যে প্রচলিত বিবিধ মণি-রত্ন ও তদ্বিষয়ক কিংবদন্তী সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের এই অংশ হইতে অতীত যুগের অলঙ্কারাদি ও তৎকালের প্রচলিত রত্নাদি-সমূহের বেশ একটি সুসঙ্গত বিবরণ পাওয়া যায়। এ দেশেও 'পুত্রকামা' নারীর রত্নবিশেষ ধারণ করা নিষেধ ছিল, কিন্তু সে রত্ন ফিরোজা (turquoise) নহে—'বজ্র' বা হীরক। ফিরোজার গুণাগুণ সম্বন্ধে এ উক্তিটি, এ স্থলে বড়ই অশোভন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে যাহা অশুভ ও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে (ন ধারয়েৎ পুত্রকামা নারী বজ্রং কদাচন),ওয়াইল্ড হেরোদের 'জবানী'তাহাই যেন পরম ঈপ্সিতের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারীর নিকট পিতৃব্যের এ সকল পাপকথা যে কিরূপ বীভৎস বলিয়া বোধ হওয়া উচিত, তাহা নাট্যকার বুঝাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ preventiveএর check এই উপাসনা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপার, সে কালের লোকের মুখে ইহা মানাইবে কেন?

মন্দিরের গর্ভগৃহের পবিত্র উপকরণ এইরূপে খেলাৎ দেওয়ার কথা হইতেছে, শুনিয়া উপস্থিত ইহুদীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভবী কিন্তু ভুলিবার নয়। এত ধনরত্ন—জগতের নানা দেশ হইতে সংগৃহীত এত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, এত অমূল্য অদৃষ্টপূর্ব্ব সামগ্রী, সব তুচ্ছ করিয়া সে যে সেই ইওকানানের মাথা লইব বলিয়া পণ করিয়াছে, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ক্ষোভ ও চিত্তচাঞ্চল্যজনিত অবসাদে ক্লান্ত হইয়া হেরোদ অবশেষে আসনে এলাইয়া পড়িলেন—সংজ্ঞাহীন জড়তা আসিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনিচ্ছায়, যেন চিত্তবৃত্তির অনধীনভাবে, সম্ভবতঃ ক্রোধ ও বিরক্তির ঝোঁকে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "যাহা চায়, উহাকে তাহাই আনিয়া দিক্! যেমন মা, তেমনি মেয়ে!" মুখের কথাটি বাহির হইতে যা বিলম্ব। পুরোবর্ত্তী সৈনিক নিকটে সরিয়া আসিল। মৃত্যু আজ্ঞাজ্ঞাপক মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি দ্রেত্রার্কের অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লইয়া হেরোদিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিতেই সে তাহা ভয়বিহ্বল ঘাতককে সমর্পণ করিল। ঘাতক নিমকের চাকর; হত্যা করাই তাহার পেশা; কিন্তু সাধুর প্রাণ বিনষ্ট করিতে হইবে শুনিয়া তাহার কঠিন হৃদয়ও অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া উঠিল। পাশা একবার হস্তচ্যুত হইলেই সর্ব্বনাশ। হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। মুদ্রাচিহ্নিত অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার হাতে আর নাই, কখন্ কে খসাইয়া লইয়াছে। হেরোদের এ হুঁস হইবার পূর্ব্বেই তাহা ঘাতকের হাতে পঁহুছিয়া গিয়াছে। তখন সত্য বা কাল্পনিক অশুভসূচনা লক্ষ্য করিয়া অনুতাপ করা বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। কিন্তু বুঝিয়াই বা বুঝে কয় জনা; হেরোদ বারংবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "আমার পানপাত্রে সুরা ছিল—অল্পস্বল্প তো নয়, কানায় কানায় পরিপূর্ণ; আমার সে মুখের জিনিস খাইল কে? নিশ্চয়ই কাহারও না কাহারও অমঙ্গল ঘটিবে।" হেরোদের কথা সমাপ্ত না হইতেই ঘাতক যোহনের কারাগারে—সেই জলাধার-মধ্যে নামিয়া গেল। এখন জুডিয়ারাজের পূর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুশোচনার আর সীমা রহিল না। এই স্থলে যে উক্তি দ্রেত্রার্কের মুখে অর্পিত হইয়াছে—তাহা ত্রেতাযুগ হইতে আজিকালিকার দিন পর্য্যন্ত রাজনীতির একটি মূল সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে যে যাহা করে করুক, রাজাদের পূর্ব্ব হইতে চট্ করিয়া কোন একটা কথা দিতে নাই। অনেক স্থলেই কথা রাখিলেও যেমন বিপদ্, না রাখিলেও তেমনি বিপদ্। হেরোদিয়ার মনোবাঞ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইতে বসিয়াছে, তাই সে কন্যার এ কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। হেরোদের শুধু এক ভাবনা—হঠাৎ কি একটা দৈবী আপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সালোমের এখন আর কাহারও প্রতি লক্ষ্য নাই। সে জলাধারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ভিতরে কি শব্দ হইতেছে, শুনিতে গেল; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। অন্তিম-কালে লোকটা একবার আর্ত্তনাদ কি চীৎকার কিছুই করিল না। সালোমে এ নিস্তব্ধতার

বড়ই আশ্চর্য্য হইল। যদি কেহ তাহার নিজের মাথা কাটিতে যাইত, তাহা হইলে সে চীৎকার করিয়া— ঝটাপটি করিয়া একটা বিষম হাঙ্গাম বাধাইত, এমনি করিয়া নিঃশব্দে বিনা ওজরে কখনই কাজ হাসিল হইতে দিত না। হঠাৎ সালোমের মনে হইল, হাবশী নামান্ হয় তো ভিতরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনও খড়্গাঘাত করে নাই,তাই ঘাতককে ডাকিয়া বলিল, "নামান্, তুই বসাইয়া দে, আমি বলিতেছি, কাটিয়া ফেল্।" কিন্তু ইহার উত্তরে কিছুই শুনা গেল না—সে ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ হইল না। হঠাৎ মাটীর উপর কি যেন একটা পড়িয়া যাওয়ার শব্দ শ্রুত হইল, সালোমে ভাবিল, বুঝি ঘাতকের তরবারিখানা মাটীতে পড়িয়া গেল, এ হতভাগার হয় তো ভয় হইয়াছে, তাই তরবারি হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কাপুরুষ কৃতদাসের দ্বারা এ কার্য্য হইবার নহে, শেষে দেখিতেছি, সৈনিকই পাঠাইতে হইল। রাজকুমারী (মৃত সৈন্যাধ্যক্ষ নারাবথের বন্ধু) হেরোদিয়ার পরিচারককে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি না সেই মৃতব্যক্তির বন্ধু ছিলে, তা আজ মৃতের সংখ্যা তো তেমন বেশী হয় নাই, সৈন্যগণকে বলিয়া দাও, তাহারা (জলাধারের) ভিতরে নামিয়া আমার প্রার্থিত বস্তু আনয়ন করুক। টেট্রার্ক যাহা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তো আমার ন্যায্য প্রাপ্য।"

পরিচারক শুনিয়া পিছাইয়া গেল। সালোমে তখন স্বয়ং সৈনিকগণকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন; বলিলেন, "তোমরা ভিতরে নামিয়া আমাকে উহার মাথা আনিয়া দাও।" আদেশ শুনিয়া তাহারাও পিছাইয়া পড়িল। সালোমে হেরোদ-সন্নিধানে সৈনিকগণের প্রতি আদেশের জন্য আবেদন করিতে যাইবে, এমন সময় কৃষ্ণকায় ঘাতকের বিশাল বাহু জলাধারের ব্রোঞ্জবেষ্টনী ছাড়াইয়া বাহির হইল। ঘাতকের হাতে রূপার ঢাল, তাহার উপর ইওকানানের সদ্যঃকর্ত্তিত মুণ্ড। সালোমে সাগ্রহে উহা হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইল। এ দৃশ্য দেখিয়া হেরোদ অঙ্গাবরণে মুখ ঢাকিলেন; হেরোদিয়া হাসিতে হাসিতে পাখার বাতাস খাইতে লাগিলেন। আর খ্রীষ্টবাদী নাজারীয়েনগণ জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর ইওকানানবিধুরা রাজকুমারীর যে সুদীর্ঘ উক্তি, তাহা 'সালোমে-বিলাপ' বলিলেও চলে। অনেকের মতে নাটকের এইটুকুই নাকি জোরালো অংশ। এ বিলাপে অশ্রু নাই, আছে শুধু রুদ্ধ রোষ ও ও বাসনার হতাশ্বাস। যে ইওকানান তাহাকে চুম্বন করিতে চাহে নাই, এখন তাহাকে চুম্বন করিতে তাহার সে অধরপুট—পাকা ফলটির ন্যায় দংশন করিতে আর বাধা কি? কিন্তু যে আঁখি দেখিয়া এত ভয় হইত, যে চোখের দৃষ্টি শুধু ক্রোধ ও অবজ্ঞায় পূর্ণ ছিল, তাহা এখন মুদ্রিত রহিয়া'ছে কেন? তাই সালোমে বলিতে লাগিল "ইওকানান, একবার আঁখি-পাতা উঠাইয়া চাহিয়া দেখ, একবার চক্ষু দুইটি উন্মীলন কর। কেন, আমাকে দেখিয়া ভয় হইতেছে না কি? সেই জন্যই কি চোখ চাহিতে পারিতেছ না? তোমার সে রাঙা সাপের মত জিহ্বা এখন যে একেবারেই নীরব—নিস্পন্দ—অসাড়। যে জিহ্বা সর্পেরই ন্যায় বিষ

বিক্ষেপ করিত—যাহা তাহার সমস্ত গরল আমারই উপর ঢালিয়া দিয়াছিল—তাহা আর নড়িতেছে না কেন?……তুমি তো আমাকে চাহ নাই—স্বেচ্ছায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে। কত ঘৃণিত কথা, কত ব্যঙ্গ, কত নিন্দাবাদ আমার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছ। আমি রাজকুমারী—হেরোদিয়ার কন্যা। জুডিয়ার রাজবংশে আমার জন্ম। তুমি আমাকে সামান্যা গণিকার ন্যায় অপমান করিয়াছ। ভাল, তোমার তো ইহলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার সে মূর্ত্তিটি যে আমি এখনও দেখিতেছি। তোমার এ মুণ্ডটির যে এখন আমিই মালিক। আমি ইহা লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারি—কুক্কুরের মুখেও ফেলিয়া দিতে পারি, কাক-শকুনিকেও খাইতে দিতে পারি। কুক্কুরের যাহা ভুক্তাবশেষ থাকিবে, শকুনিতে তাহা উদরস্থ করিবে। ইওকানান! এ জগতে শুধু তোমাকেই ভাল বাসিয়াছিলাম। আর—আর সব পুরুষ দেখিয়া আমার ঘৃণা হইত; কিন্তু তুমি—তোমার কথা আর কি বলিব! তোমার দেহের সে কি কান্তি—কি সৌন্দর্য্য! তোমার দেহযষ্টি যেন রূপার বেদীর উপর হস্তিদন্তের স্তম্ভ—যেন কপোত-ভরা সখের বাগান রূপার লিলি-ফুলে সাজান। দেহ তো নয়, যেন রূপার বুরুজে হস্তীর দাঁতের ঢাল আঁটা! তোমার শরীরের সে শুভ্রতা জগতে আর কোথাও দেখি নাই। তোমার মুখের এ সৌন্দর্য্য, 'বাঁধুলি' অধরের এ শোণিমা ভুবন খুঁজিয়া আর কোথাও পাই নাই। তোমার মোহন স্বরে ধূপদানের ধূমের ন্যায় কি সুগন্ধোচ্ছ্বাস বাহিত হইত—তোমার দিকে চাহিয়া থাকিলে কি সুন্দর স্বরলহরী কর্ণে প্রবেশ করিত! হায় ইওকানান, কেন তুমি আমার প্রতি চাহিয়া দেখ নাই? তোমার হাত দুখানির আড়ালে—তোমার কটূক্তি ও নিন্দা-গ্লানির আবরণে তুমি তোমার মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে। যাহারা ভগবদ্দর্শনে একান্ত অভিলাষী, তাহাদিগের ন্যায় তুমিও বস্ত্রবন্ধনে তোমার চক্ষু আবৃত করিয়াছিলে। ভাল, তুমি তো তোমার আরাধ্য ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ; কিন্তু আমার এ রূপ তো তোমার দেখা ঘটিল না। ইওকানান, তুমি যদি আমাকে দেখিতে, তাহা হইলে হয় তো ভালও বাসিতে। আমি তোমাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, তেমনি ভালবাসিয়াছিলাম। সে কথা আর কি বলিব—এখনও শুধু তোমাকেই ভালবাসি। তোমার রূপদর্শনের সে তৃষ্ণা এখনও আমার মিটে নাই—স্পর্শনের সে ক্ষুধা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। এ কামনা-সুধাপানে—ফলাহারে কিছুতেই শান্ত হইবার নহে। ইওকানান, এখন আমার উপায় কি? এ অনুরাগবহ্নি—এ মনাগুন খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর স্রোতে, হ্রদাদি জলাশয়ের বিশাল জলরাশিতে—কিছুতেই নিভিবে না। আমি রাজকন্যা, তুমি আমাকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করিয়াছ; আমি কুমারী, তুমি আমার কৌমার্য্য মোচন করিয়াছ; আমি সাধ্বী ছিলাম, তুমি আমার শিরা-উপশিরায় আগুন ছুটাইয়াছ। হায়! হায়! কেন তুমি আমার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলে না? দেখিলেই ভালবাসিতে; আমি নিশ্চয় জানি, তুমি না

ভালবাসিয়া পারিতে না। প্রণয়ের সুমহান্ নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত মৃত্যু-রহস্যের তুলনা কোথায়? প্রণয় ছাড়া আর কিছুরই দিকে চাহিতে নাই।"

হেরোদ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন—সকল কথা শুনিয়া হেরোদিয়াকে বলিলেন, "তোমার কন্যার এ কি বিকট অস্বাভাবিক ব্যবহার? এ যে একেবারেই অমানুষিক দেখিতেছি! ও যাহা করিয়াছে, সে ত গুরুতর অপরাধ। উহার এই ব্যবহার নিশ্চয়ই কোনও অজ্ঞাত দেবতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।"

পূর্ব্বে হেরোদিয়াই বাহিরের এ মজ্‌লীস্ ভাঙ্গাইয়া উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এখন তিনি আর উঠিতে চাহেন না। ত্রেত্রার্ক-মহিষী এখন প্রকাশ্যভাবে কন্যার কার্য্যকলাপের সমর্থন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। আমি এখন এইখানেই বিশ্রাম করিব।"

হেরোদের আর সহ্য হইল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"এ সব কথা গম্যাগম্যভেদহীনা দুষ্টা নারীর মুখেই শোভা পায়। আয় উঠিয়া আয়, আর—আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। এখনি চলিয়া আয় বলিতেছি। আমার ঠিক বোধ হইতেছে, এখনই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। মানাসে! ইসাকার! ওজিয়া! দে, তোরা সব দেউটি নিবাইয়া দে। আমি আর কিছুই দেখিতে চাহি না, আমাকেও যেন কোন কিছুতে দেখিতে না পায়। দে মশালগুলা নিবাইয়া—চাঁদ ঢাকিয়া ফেল্—তারাগুলা সব ঢাকিয়া ফেল্—আয় হেরোদিয়া, আমরা রাজপুরীর মধ্যে লুকাই গিয়া—আমার ভয় লাগিতেছে!" পাপের বন্ধন অনেক স্থলে প্রেমবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য, তাই কাল আসন্ন জানিয়া, দুর্ব্বলচিত্ত পাপাশয় সকল বিরাগ, সকল বিদ্বেষ তুচ্ছ করিয়া দৃঢ়চিত্তা সহযোগিনীর সাহচর্য্যটুকুই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়!

ক্রীতদাসগণ দেউটি নিবাইয়া দিল, নক্ষত্র সব অদৃশ্য হইয়া গেল—বিশাল ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ডের অন্তরালে আকাশের শশী লুক্কায়িত হইল, সমস্ত দৃশ্যপট ঘনান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ইওকানানের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বসিয়াছে দেখিয়া, ভয়বিহ্বল ত্রেত্রার্ক আর দোসরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একাই সোপান-শ্রেণী আরোহণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ চকিত—নিস্তব্ধ। শুধু এই তমিস্র যবনিকা ভেদ করিয়া, সালোমের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। সালোমে বলিতেছিল, "ইওকানান, তোমার অধরে অধর ত মিশাইলাম। কিন্তু ওষ্ঠাধরে একটু অম্লাস্বাদ কেন? এ কি তবে রক্তের আস্বাদ? কে জানে? বুঝি বা প্রণয়েরই আস্বাদ এইরূপ! লোকের মুখে তো শুনিতে পাই, ভালবাসার আস্বাদ বড়ই অম্ল—বড়ই তীক্ষ্ণ; যাউক গিয়া, তাহাতে আসে যায় কি? ইওকানান! আমি তোমার অধরসুধা পান করিয়াছি।"

চন্দ্রের একটিমাত্র কিরণসম্পাতে সালোমের মূর্ত্তি হঠাৎ আলোকমণ্ডিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে প্রাসাদের প্রশস্ত সোপান বাহিয়া উঠিতে উঠিতে হেরোদ হঠাৎ ফিরিয়া

চাহিয়াই সালোমেকে দেখিতে পাইলেন। এবার তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া গেল—এক নিমেষে লালসার স্থান ঘৃণা আসিয়া অধিকার করিল। হেরোদ হুকুম দিলেন, "এই নারীকে এখনই মারিয়া ফেল।" বলিতে বলিতেই সৈনিকগণ তাহাদিগের ঢালের চাপে সালোমেকে পিষিয়া ফেলিল। হেরোদিয়ার কন্যা—জুদিয়ার রাজকুমারী সালোমের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

ধার্ম্মিক বলিবেন, সাধুর অভিশাপ-বাণী পাপিষ্ঠাকে চর্ম্মনিষ্পেষণে মারিবার কথা এতক্ষণে ফলিয়া গেল। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, হঠাৎ রক্তদৃষ্টে হেরোদের যে সুপ্ত মনোবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার সেই Sadistic ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইল।(১) ইওকানান সালোমের মাতার প্রতি গালিবর্ষণকালে "ঢালে চাপিয়া মারা" সম্বন্ধে যে উক্তিটি করিয়াছিলেন, হঠাৎ প্রদত্ত সে ইঙ্গিত (suggestion) পরে বলবতী হইয়া উঠিল। নারাবথের রক্তদৃষ্টে sadistic চিন্তা যদি উন্মেষিত না হইত, তাহা হইলে খাবার টেবিলের শ্বেত আস্তরণের উপর গোলাপ-পাপড়িগুলি দেখিয়া রক্তের কথা মনে হইবে কেন? যাউক সে কথা।

সালোমের পালা তো শেষ হইয়া গেল; কিন্তু কথার জের—সমালোচনার বাদানুবাদ এখনও মিটে নাই।

সালোমে কর্ত্তৃক ইওকানানের দেহ-বিচ্যুত মস্তকের অধর-চুম্বন এক্ষণে অভিজ্ঞ সমাজে Necrophilia বা শবাসক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আমাদের চোখে এত অর্থ ধরা পড়ে না, তাই সাধুর বিষবর্ষী জিহ্বা লালসর্পের সহিত তুলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার ভিতরও একটা ইঙ্গিত বা গূঢ়ার্থ-প্রকাশক অভিপ্রায় অনুসন্ধান নিতান্ত অযৌক্তিক ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধবাদী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমালোচকগণ হয় ত বলিবেন, সর্পচিহ্ন প্রায়শঃ লিঙ্গপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট; Squears সাহেব না কি এ কথা Serpent Symbol গ্রন্থে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইয়াছেন। আবার Freude ও তৎশিষ্যগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত চিন্তাবিশ্লেষণফলে কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে —সাপের স্বপ্ন প্রভৃতি আমাদিগের 'সেকেলে' বিশ্বাসমত জ্ঞাতিবৃদ্ধির দ্যোতনা না করিয়া কামজ (Erotic) চিন্তাই জ্ঞাপন করে (Psycho-analysis Dr. Brile P. 152.) এরূপ যুক্তির নিরসন সহজ নহে। পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি বুঝুন—'হৃদয় তাহার আপনার কথা আপন মর্ম্মে বুঝিয়া নিক্।' আমরা আর বৃথা বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিব না।

---

(১) It sometimes happens that an accidental sight of blood &c, puts into motion the preformed psychical Mechanisom of Sadistic individual and awakens the instinct—kraft-Ebbing's Psycho-Sex P. 86 footnote.

'সালোমে' নৃত্যতৎপরা অভিনেত্রী কুমারী মড্ এলেনের মোকর্দ্দমায় বিচার করিতে বসিয়া বিচারক বলিয়াছিলেন, অস্কার ওয়াইল্ড নিপুণ সাহিত্যশিল্পী বটে, কিন্তু তাঁহার পশুত্বও বেয়াড়া রকমের। তাঁহার চরিত্রের কথা ধরিতে গেলে এ অভিযোগ অস্বীকার করার যো নাই। ওয়াইল্ডের গ্রন্থাদির মধ্যে এই সালোমে নাটকখানিই দেশে বিদেশে সমধিক প্রচারিত; সুতরাং ইহাকেই তাঁহার রচনাভঙ্গীর প্রতিনিধিমূলক (representative) বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা এ পুস্তকে হিন্দুর—তথা প্রাচ্যমানবের চক্ষে যাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হওয়া সম্ভব, তাহা উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। ওয়াইল্ডের ওকালতী করার জন্য apologist রূপে তাঁহার পক্ষসমর্থন করার উদ্দেশ্যে—এ নিবন্ধ রচিত নহে। পুস্তকের গল্পাংশের এই বিবরণ ও বিবৃতি যিনি কষ্টস্বীকার করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহার ভালমন্দ নির্ণয় করা কষ্টকর হইবে না।

অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিভা-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ রুসোর প্রতি প্রযুক্ত কার্লাইলের ভাষায় বলিতে পারেন যে, ওয়াইল্ড সাহিত্যক্ষেত্রে সামান্য বিষাক্ত সর্পমাত্র নহে—অনন্ত নাগ। (a serpent of eternity and not a common viper) কিন্তু আধুনিক সমালোচক সকলে ইহা মানিয়া লইবেন কি না সন্দেহ।

শ্রীভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র।

সমাপ্ত।

ভাগ্যহীনা

হাওয়া খাইতে কাশী আসিয়াছি। হাওয়া খাওয়াই বল, আর তীর্থ করাই বল, এখানে আসিয়া দুটোই পাওয়া যায়,—যেমন "রথ দেখা ও পাথর কেনা।" বাহির-মহল হইতে আসিয়াছেন, স্বয়ং খোদ কর্ত্তা ও তাঁহার খাস-মহলের চাকর হরিচরণ। অন্তঃপুর হইতে আসিয়াছে, দাসী-মহলের প্রধানা এবং কলহশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া—ক্ষেমির মা। আর আসিয়াছি—শ্রীমতী আমি। বড়দের সঙ্গে একটি নেজুড়ীরও আবির্ভাব হইয়াছে, সেটি সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব নয়। এখন ত বাপের গোত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাই এতদিন যাহারা নিজের লোক ছিল, এখন তাহারা পর হইয়া গিয়াছে, আর যাহারা পর ছিল, তাহারাই নিজের লোক হইয়াছে। এই নিয়মই না কি মনু, পরাশর প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন! শৈলি আমার নিজের ছোট বোন্ হইলেও এখন আর তাহাকে নিজস্ব বলিতে পারি না।

কাশীপ্রবাসী বিপিন বাবুর উপরে বাড়ী ঠিক করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এ বাড়ীতে ঢুকিয়াই আমি মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঠিক কেদারঘাটের উপরেই বাড়াখানা; মনে হয়, গঙ্গাগর্ভ থেকেই তৈয়ারী হইয়াছে। বড় সুন্দর স্থান, বড় মনোরম স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে বসিয়াই ঐ দুকুল-বাহিনী, শরতের সুপ্রসন্না, রৌদ্রে উদ্ভাসিতা, কল্লোলগীতিমুখরা গঙ্গার সুবিশাল মূর্ত্তিটি দেখিতে পাই। কত নৌকারোহী অনুকূল পবনে শাদা পাল উড়াইয়া ভাটিয়ালি সঙ্গীতে গঙ্গা-বক্ষ মুখরিত করিয়া যাইতেছে। কত বালক ও কিশোর সম্মিত হইয়া সাঁতারে সাঁতারে গঙ্গার স্বচ্ছজল ঘোলা করিতেছে। রক্ত, নীল, শাদা, কত ফুল ও বিল্বদল গঙ্গাগর্ভে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি মধুর দৃশ্য, চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

নূতন স্থানে আসিয়াছি বলিয়া রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। রাত্রিপ্রভাত হইলেই সব দেখিতে পাইব, এই কথা মনে হইতেই হৃদয়ের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। প্রভাতে বিছানায় শয়ন করিয়াই শুনিতে পাইলাম—গঙ্গাস্নানযাত্রীদের কোলাহল ও মা গঙ্গার সুললিত পদাবলী। প্রভাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভক্তকণ্ঠে গদগদস্বরে শঙ্করাচার্য্যের অতুলনীয় "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে" শুনিয়া দুইটি হস্ত যুক্ত করিয়া মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। আর প্রণাম করিলাম, সেই এই অতুলনীয় পদাবলীর রচয়িতা শঙ্করাচার্য্যকে।

এ কয়েকদিনে কাশীর দর্শনীয় অনেকটাই দর্শন করিয়াছি। জগতের এই অপূর্ব্ব শান্তিধাম থেকে আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে সাধক ও সিদ্ধি যেন পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মা অন্নপূর্ণার দুয়ারে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ভিখারী; এমন দৃশ্য জগতে

আর কোথায় আছে? কাশীর তুলনা কাশীতেই। কলিকাতার "মণিকোঠা" ছাড়িয়া এখানে আসিয়া বড় সুখে, বড় শান্তিতে রহিয়াছি।

এখানে মেয়েদের অন্তঃপুরে আলো-বাতাস-বর্জ্জিতা হইয়া থাকিতে হয় না। ছোট বড় ঘর নাই, ইচ্ছা করিলেই সকলেই অবাধে রাস্তায় বাহির হইতে পারে। গায়ে একখানা কাপড় ঢাকা থাকিলেই হইল। বাঙ্গালীর মেয়েরা যে কাশী কাশী করিয়া এত উতলা হন, ইহার মূলাধার বুঝি একটু স্বাধীনতার প্রয়াসে।

লোকে কথায় বলে, "বেশী সুখ সয় না।" আমাদেরও তাই হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী আসিয়াও নিস্তার নাই দেখিতেছি। এখানেও রাস্তা-ঘাট "হরিবোল" ও "রাম রাম" শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। মৃত্যু-রাক্ষসী শুধু কলিকাতাতেই তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে নাই, এমন সোনার দেশেও তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া ওঠে। কর্ত্তাটি তো এখানে আসিয়া "টো-টো" "কোম্পানীর" ম্যানেজার হইয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত দিনের ভিতর এক স্নানাহারের সময় ভিন্ন তাঁহার চুলের টিকীটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। রকম-সকম দেখিয়া সময় সময় ভারী রাগ হয়, আবার একটু করুণাও না হইয়া যায় না। আহা, চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালী! বারমাসই ত ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, অসুখ নাই, বিসুখ নাই—ঘানিগাছে কলুর বলদের মত ঘুরিয়াই মরা। কর্ত্তাটিকে আজ নিরালা পাইয়া বলিলাম, "কাশীর ত সমস্তই দেখাশুনা হইয়াছে, চল এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক্, এখানে যে মড়ক লেগেছে, বড় ভয় হয়!" উত্তর হইল, কল্কাতায় কি লোক মরে না? তোমার যদি এতই ভয়, তুমি হরিচরণের সাথে শৈলিকে আর ক্ষেমির মাকে নিয়ে চ'লে যাও। আমি ছুটীর কটা দিন বিপিনের ওখানেই কাটাতে পারবো।" আমি বলিলাম, 'আমার নিজের জন্য আমি ভয় করিনে, তোমার জন্যই ভাবনা হয়।" তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার যদি কাশীপ্রাপ্তিই অদৃষ্টে লেখা থাকে, তার জন্য তোমার চিন্তা কিসের? সে তো তোমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।" কথার রকম দেখেই গা জ্বালা করে! রাগ ক'রে ঘর থেকে চলিয়া আসিলাম।

নিস্তব্ধ দুপুরবেলা, হাতে কোন কাজ নেই; মেজদিদিকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। মেজদিদিকে চিঠি লেখা বড় শক্ত কাজ, অনেক মাল-মসলার দরকার; আমার বাপু অত কারীকুরী আসে না। কিন্তু মেজদি মাথার দিব্য দিয়া বার বার বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে চিঠি লিখিতে যেন আমার ভ্রমণের একটি সুদীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট "ডায়েরী" লেখা হয়। একটি কথা যেন বাদ না যায়। সে কবি মানুষ কি না, তার আশা, কাশী না দেখেই শুধু আমার চিঠিটা পড়েই কবিতা লিখিতে পারিবে। তাই বর্ণনা-বহুল সুললিত করিয়া পত্র লেখার ভার আমার ঘাড়ে চাপাইয়া, পত্রের প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রায় দুই তিন ডজন কবিতা লিখিবার

খাতা কিনিয়া 'বোচ্‌কা-বিড়ে' বাঁধিয়া মেজদি আমাদের সহযাত্রীই হইতে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ ছেলের অসুখ হওয়াতে তাঁহার সমস্ত আশাই আকাশকুসুমে পরিণত হইল।

এখানে আসা হইল না বলিয়া তাঁহার যত দুঃখ না হোক, তাঁহার এত সাধের কবিত্ব-কল্পনা যে হৃদয়-গুহায় আবদ্ধ থাকিয়া আকুলি-বিকুলি করিবে, এই দুঃখেই তিনি বড় দুঃখিত। তখন অনেক কথাই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলাম; এবং আমি খুব বড় ক'রে প্রতিদিনকার ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইব, এ কথাও স্বীকার করিয়াছিলাম। আজ তো ভাবিয়াই আমার চক্ষুস্থির! আমার অতিবড় শত্রুও আমাকে কবি বা কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অপবাদ দিতে পারে না। আমি আজ ভাবুকতা কোথায় পাব? তোমরা কেউ ধার দিবে ভাই? আকাশের দিকে চাহিয়া কোন কূল-কিনারা পাইলাম না। শুধু দেখিলাম, শরতের সুপ্রসন্ন অসীম উদার স্বচ্ছ আকাশ —সূর্য্যের উজ্জ্বলপ্রভা দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠিতেছে। "ও সেজদি, দেখে যাও ভাই, রাস্তায় কি কাণ্ড হচ্ছে"—শৈলি ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি কথা কয়েকটি বলিয়াই, তেমনি ত্বরিতপদে চঞ্চলার মত ছাদে উঠিয়া গেল। মেজদিদির চিঠি চুলায় যাক্; আমি শৈলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাদে উঠিয়া দেখি, রাস্তায় কতকগুলি লোক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছে, আর ভীষণ-কণ্ঠে "বল হরি, হরি বল্" বলিয়া রাস্তা মুখরিত করিতেছে। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা তাহাদের কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে কিছুমাত্রও কোমলতা নাই,—সে অমানুষিক ভীষণ শব্দেই হৃদয় শিহরিয়া উঠে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া আসিতে আসিতে চাহিয়া দেখি, ভিড়ের ভিতরে একটি স্ত্রীলোক অস্পষ্ট কণ্ঠে কি যেন বলিতেছে, আর ললাটে করাঘাত করিতেছে। তাহার একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া সাধারণ ভিখারী বলিয়া বোধ হয় না; ভদ্রঘরের রমণী বলিয়া মনে হয়। হয় ত দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া আজ উহার এই দশা হইয়াছে। অসভ্য ইতর লোকগুলির অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা হইল না। নীচে চলিয়া আসিলাম।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে শুনিলাম, হরিচরণের সহিত ক্ষেমির মা'র ভয়ানক বাক্যযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। এ কয়েকদিন এই নিত্তনৈমিত্তিক কার্য্যে উহাদের অবহেলা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, এই নূতন মহাতীর্থে আসিয়া উহাদের দারুণ বিদ্বেষভাব সন্ধিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমার ভুল ধারণা হইয়াছিল, বেশ বুঝিলাম। সহসা উপস্থিত হইয়া উহাদের এত বড় কুরুক্ষেত্রের বুকে যবনিকা প্রসারিত করিতে ইচ্ছা হইল না; অন্তরালে দাঁড়াইয়া উহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

ক্ষেমির মা তাহার কাংস্যবিনিন্দিত-কণ্ঠে কহিতেছে, "বল্ হতভাগা, আমার আঁচল থেকে পয়সা খুলে নিয়েছিস্।" হরিচরণ তাহার ভাঙ্গা জয়ঢাকের মত গম্ভীর আওয়াজে

কহিল, "মর্ মাগী, আমি কেন তোর আঁচল থেকে পয়সা নিতে যাব?" রাস্তায় কি দেখ্‌তে গিয়েছিলি, কে খুলে নিয়েছে; আমি তার কি জানি?" "তুই জান্‌বি কেন মুখপোড়া, পাড়াপড়সী জানে। রাস্তার লোকের তো কাজ নেই, আমার আঁচল থেকে পয়সা নিতে এসেছিল। এ কাজ আর কারো নয়, এ তোর কাজ, তুই একটা আধলার লোভ সামলাতে পারিস্ না, এ ত দুই আনা পয়সা।" হরিচরণ ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিল, "এক চড়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব, জানিস্? ভারী তোর দুই আনা; বাবুর জামাকাপড়ের ভিতর কত দুই আনা রোজগার করি, জানিস্ মুখপুড়ি?" আমার ভয় হইতেছিল, শেষে বাক্যযুদ্ধের পরিবর্ত্তে সত্য যুদ্ধই বুঝি আরম্ভ হয়। ক্ষেমির মা উচ্চ চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া বলিল, "তুই বাবুর জামা-কাপড়ের মধ্যে থেকে রোজগার করিস্ ব'লে অহঙ্কারে অস্থির হচ্ছিস্; আমি বুঝি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকি? ভাঁড়ারে থেকে আমি যা রোজগার করি, তুই তা ছয় মাসে পাবি না, জেনে রাখিস্!" আজ এই পুরাতন বিশ্বাসী ঝি-চাকরের নিজমুখের স্বীকারোক্তি শুনিয়া মনটা বড় প্রসন্ন হইল না। ওখান থেকে চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতা ফিরিবার দিনও হইয়া আসিল। এক মাস মাত্র—ত্রিশটি দিন বই ত নয়। এর ভিতরেই ফুরাইয়া গেল। কাশী ছাড়িয়া আর যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। এমন আনন্দভবন, এমন সুখের স্থান, কে যেন কি একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু তবুও যাইতে হইবে। মনটা বড় বিষণ্ণ লাগিতেছে। তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া শেষ করিয়া, আজ একবার দুর্গাবাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে। তাঁহাকে বলিলাম, "চল দুর্গাবাড়ী যাই।" তিনি বলিলেন, "হরিচরণ নিয়ে যাক, আমার সময় নেই।" সময় আর থাকিবেও না। পাশার আড্ডায় সব সময় খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা তুলিয়া অনর্থক তর্ক করিতে ইচ্ছা হইল না, তাই চুপ করিয়াই রহিলাম।

আমরা যখন দুর্গাবাড়ীর চাতালে গাড়ী হইতে নামিলাম, তখন সূর্য্যাস্তের শেষ রৌদ্ররেখা দুর্গাবাড়ীর চূড়ায় ঝল্-মল্ করিতেছে, ঘনায়মান সন্ধ্যা ধরণীর প্রফুল্লমুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। মন্দিরের মধ্য হইতে ভক্তপূজিত নির্ম্মাল্য-কুসুমের মৃদুগন্ধটুকু বহিয়া ধীরে ধীরে সমীরণ বহিতেছিল। এই স্থানটি বেড়াইবার পক্ষে বড় সুন্দর, বড় নিরিবিলি; আমার বড় ভাল লাগে। ঠিক ছায়ানিবিড় আম্রকাননে ঘেরা পল্লীভবন বলিয়া মনে হয়। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইয়া মনে মনে আজ শেষ বিদায় লইতেছিলাম। হয়ত এ জীবনে আর এখানে না আসিতে পারি। "ও সেজদি, দেখেছ ভাই, আবার সেই এসেছে।" শৈলির আহ্বানে চাহিয়া দেখি, আজিও সেই সেদিনকার স্ত্রীলোকটি রাস্তা দিয়া যাইতেছে। আজও তাহার পশ্চাতে কয়েকটি লোক অনবরত হরিধ্বনি করিতেছে। বড় কৌতূহল হইল। একটি মুখের কথা কি এ রমণী সহিতে পারে না? পাগল বলিয়াও তো মনে হয় না; বরং তপস্বিনী পবিত্রহৃদয়া পুণ্যবতী দেবীমূর্ত্তি যেন

উহার ভিতরে লুকাইয়া আছে। ক্ষেমির মাকে পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরে ক্ষেমির মার পশ্চাতে স্ত্রীলোকটি দুর্গাবাড়ীর চাতালে প্রবেশ করিল। সে যখন আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, রমণী এখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে নাই। যৌবনে সে যে অসাধারণ লাবণ্যবতী ছিল, আজও সে চিহ্ন উহার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। রমণী আমার নিকট বসিয়া পরিষ্কার বাংলায় মধুর-কণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?" আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম দেখিয়া রমণী পুনরায় কহিল, "কি কথা বলিবে মা, বল না কেন? আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কর। মা, তুমি আজ আমাকে ডাকিয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দ হইতেছে; আজ কত বছর কেহ ডাকিয়া একটি মুখের কথাও কয় না।" এই বলিয়া রমণী একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রমণীর মহিমময় বিষাদপাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া ও তাহার স্নিগ্ধ-কণ্ঠের কথাগুলি শুনিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি বলিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়? এখানে তোমার আর কে আছে?" আমার কথায় সে উত্তর করিল, "মা, এখানে কেন, ইহলোকে আমার আর কেহই নাই।" আকাশের দিকে অঙ্গুলী তুলিয়া দেখাইল, "ঐখানে সকলেই আছে। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি সকলই ঐ লোকে রহিয়াছে। আমি শুধু পথহারা পথিকের মত পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান্ কবে এই সর্ব্ববঞ্চিতাকে তাহাদের সহিত সম্মিলিতা করিবে, সেই প্রতীক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছি।" আমি বলিলাম, "বাছা, তুমি কি সংসারে বড় দুঃখ-ব্যথা পাইয়াছ? তোমার সব কথা আমার শুনিতে সাধ হইতেছে।" রমণী তাহার স্নিগ্ধ-মধুর-কণ্ঠে কহিল, "আমার সব কথা কি তোমার শুনিতে ভাল লাগিবে মা? আমার জীবনের কথা গল্পের মত—

"রাজপুতানা আমার জন্মস্থান। আমার পিতা ক্ষত্রিয় ছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া আমি পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। পিতার হৃদয়ভরা স্নেহ-ভালবাসার ছায়ায় কখনও মায়ের অভাব বুঝিতাম না। মুক্ত প্রজাপতির মত বনে বনে ফুল তুলিয়া, ঝরণার পথে পাথর কুড়াইয়া আমার শৈশব অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আমি যৌবনে পদার্পণ করিলাম। আমার অন্তরাকাশের দিগন্ত হইতে যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় আমার অন্তর-বাহির সব মধুরতা-পূর্ণ হইয়া গেল। বয়সের সাথে সাথে আমার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মা, একদিন রূপসী বলিয়া আমার খুবই খ্যাতি ছিল। আজ কি আমাকে দেখিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে? রাজপুতানার বনান্তরালে ঝরণার পার্শ্বে ষোড়শবর্ষীয়া লক্ষ্মীবাইএর সহিত আজ এ তাপদগ্ধা ভাগ্যহীনা ভিখারিণীর তুলনা কোথায়?

"এই রূপের জন্যই আমাদের আশেপাশের গ্রাম হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমার পাণিপ্রার্থী যুবকদল আমার নিকটে তাহাদের কত মায়াজাল

বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু আমার হৃদয় কিছুতেই তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইত না; বরং তাহাদের নির্লজ্জ অভিনয় দেখিয়া আমার মন আরও বিমুখ হইয়া পড়িত। আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা নাই, আর একমাত্র দুহিতাকে এত শীঘ্র বিলাইয়া দিতে পিতারও ইচ্ছা ছিল না। যখন আমার ষোড়শ বৎসর বয়স, তখনও আমি কুমারীই রহিলাম। পিতা পুত্রী পরস্পর পরস্পরের সাথী হইলাম। আমি যে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি, এ কথা আমার একবারও মনে হইত না। আর আমার পিতা, তিনি বোধ হয়, আমাকে দশমবর্ষীয়া বালিকা বলিয়াই মনে করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার হৃদয়-ভরা স্নেহ-ভালবাসায় ইহাই প্রকাশ পাইত। আমার পিতা এককালে রাজসরকারে সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হঠাৎ মায়ের মৃত্যুতে তাঁহাকে সে চাকুরী ছাড়িয়া আমার জন্যই গৃহে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। পিতার নিকটে কত বীরত্বের গল্প, কত যুদ্ধের গল্প শুনিয়া আমার তরুণ হৃদয়খানি কত স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিত। বড় আনন্দে, বড় সুখে আমাদের দিনগুলি কাটিতেছিল। তখন যে দিকে নয়ন ফিরাইতাম, কত মধুরতার, কত নবীনতার উৎস পৃথিবীর বুকে বহিয়া যাইত। আশা, আনন্দ, উল্লাস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার নিকটে অগ্রসর হইত। মনে হইত, পৃথিবীর সমস্ত পথই বুঝি সরল ও সুপ্রশস্ত।

"সে দিন শ্রাবণের নিভৃত সন্ধ্যায় আমি পিতার পদতলে বসিয়া চিতোরের যুদ্ধ-কাহিনী শুনিতেছিলাম; বাহিরে বর্ষার পুঞ্জীকৃত অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার স্বহস্তরোপিত পুষ্পবৃক্ষের উপরে টপ্-টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। একটা দুরন্ত বাতাস ভেজা কেতকী-ফুলের তীব্র গন্ধটুকু গায়ে মাখিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ আমাদের প্রাঙ্গণ হইতে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'অতিথি।' আমি ও পিতা চমকিয়া উঠিলাম। সেই সময় বাহিরে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। পিতা উঠিয়া সাদরে অতিথিকে গৃহে আনিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে উজ্জল দীপালোকে তাঁহাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ কি দেবতা? এমন সুন্দর মূর্ত্তি, এমন মধুর অবয়ব আমি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, কোন নিপুণ শিল্পী যেন বহু যত্নে তাঁহার বড় বড় চক্ষু ও প্রসন্ন হাস্যময় মুখমণ্ডল নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়াছেন; কি গৌরবর্ণ, কি বীরোচিত দেহগঠন, সর্ব্বোপরি কি আশ্চর্য্য অতুল্য মুখচ্ছবি! সেই প্রথম পুরুষের রূপে আমার নয়ন দুইটি মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই দিনই আমি মজিলাম, মরিলাম। আমার কুমারী-চরিত্রের যত দৃঢ়তা, যত ধৈর্য্য, একটি দম্‌কা বাতাসে শুষ্ক তৃণের মত কোথায় উড়িয়া গেল। সেই দিনই আমার জীবন, যৌবন সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম। ভয় হইতেছিল, যদি আমার এ স্বপ্ন সত্য না হয়? কিন্তু জোর করিয়া সে আশঙ্কা হৃদয় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলাম। যদি না হয় নাই

হইবে; ইহলোকে যদি না হয়, পরলোকে অবশ্যই হইবে। আর আমার ভয় কি? আমাদের দেশের কত মেয়ে ত চিরকুমারীও থাকে। আমিও না হয়, তাহাদের দলভুক্ত হইয়া আমার বাঞ্ছিতের মূর্ত্তি হৃদয়মাঝে পূজা করিব।

"তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম, তিনি বাঙ্গালী কায়স্থের সন্তান; সম্প্রতি দেশভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। দেশে এক শিশুপুত্র ও মাতা ব্যতীত আর কেহ নাই। রাজপুতানায় সমস্ত দেখা-শুনা করিতে তাঁহাকে প্রায় দশ বারো দিন থাকিতে হইল। পিতা তাঁহাকে লইয়া কত বনে, কত পাহাড়ে, কত ঝরণার পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখাইতে লাগিলেন; আমিও ছায়ার মত তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তিনি দেখিতেন রাজপুতানার কত বন, কত উপবন, কত পাহাড়-পর্ব্বত, কত নির্ঝরিণীর জলপ্রপাত, আর আমি দেখিতাম তাঁহাকে—তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত; মনে ভাবিতাম, আমি ইহাঁর নিকট সুন্দরী? না, কখনও না!! হইতেই পারে না। কত দিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিতেন, তখনই আমি এ লজ্জিত মুখখানি ও অবাধ্য চক্ষু দুটি নত করিতাম। মনে ভাবিতাম, তাঁহার দিকে আর চাহিব না, তিনি কি মনে ভাবেন, ছিঃ! মনে ভাবিতাম বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হইত না। আমার নির্লজ্জ নয়ন আবার তাঁহার দিকেই চাহিয়া থাকিত। কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, এ জীবনেও যেন তাঁহার রাজপুতানা দেখা শেষ না হয়। কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা ভগবানের চরণে পৌছিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; অথবা আমিই মূঢ়, তাই মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। তিনি উদয়পুর দেখিতে চলিয়া গেলেন; উদয়পুর হইতে ফিরিবার পথে আবার এখানে আসিবেন, এ কথাও বলিয়া গেলেন।

"তাঁহার প্রস্থানের পর আমার নিকটে যেন সব শূন্য শূন্য বোধ হইত। জগৎ যেন অন্ধকার দেখিতাম, গৃহকার্য্যে মন টিকিত না। পিতার মুখে বীরস্থানের বীরকাহিনী আর পূর্ব্বের মত সুললিত লাগিত না। 'শয়নে স্বপনে' আমি তাঁহারই চিন্তা করিতাম। তিনি যেখানে বসিতেন, যে পালঙ্কে শয়ন করিতেন, আমিও সেইখানে বসিয়া, সেই পালঙ্কে শয়ন করিয়া বড় আরাম পাইতাম। শুধু দিন গণিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া আমার দিন কাটিত। আমার হৃদয়ের গোপনীয় কথাগুলি, আমার যথাসাধ্য বাহিরে লুকাইয়া রাখিতাম; কিন্তু তখনও জানি নাই, এক জোড়া তীক্ষ্ণ স্নেহদৃষ্টির পাহারা আমার অন্তরস্থল ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মের গোপন কাহিনী জলের মত দেখিতেছে, সেখানে লুকাইবার কিছুই নাই, গোপনীয় কিছুই নাই। সে দৃষ্টি আমার পিতার।

"প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা কার্য্যাবসানে আমি তাঁহারই আশাপথ চাহিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিতাম; সে দিনও বসিয়া ছিলাম। সে দিনও শ্রাবণের নিভৃত সন্ধ্যা,—কিন্তু আকাশ

পরিষ্কার, একটু মেঘের রেখাও ছিল না। পূর্ব্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বর্ষার জল-প্লাবিত শস্যক্ষেত্রগুলি সন্ধ্যার ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পথ-ঘাট সব নির্জ্জন, আমি শুধু কল্পনারাজ্যে তাঁহার চিন্তা লইয়া বিভোর। আবার তাঁহাকে দেখিব, আবার তিনি আসিবেন, এ কথা স্মরণ করিতেও বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় দিশাহারা হইয়া উঠিতেছিল। আবার ভয়ও হইতেছিল; আমি যাঁহাকে দেখিবার জন্য,যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল, তিনি কি আমার কথা মনে করেন? তিনি মনে না করিলেন,আমি আমার এই নীরব পূজা করিয়াই শান্তি পাইব। সহসা আমার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—'লক্ষ্মি!' প্রথমে আমি চমকিয়া উঠিলাম; পরক্ষণেই লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার সাধ হইল। এ কণ্ঠস্বর তাঁহার, তিনি আসিয়াছেন। হৃদয় ত কত কথা কহিবার জন্য আকুল হইল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কোন কথাই কহিতে পারিলাম না; নীরবে নত-মুখে বসিয়া রহিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার নিকটে উপবেশন করিলেন। ক্ষণিকের জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন শিথিল হইয়া গেল; চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমারই মুখের উপরে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই দিন সেই বর্ষাস্নাত তৃণাসনে বসিয়া সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকারে তাঁহার কণ্ঠের অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। এ বাক্যহীনার কণ্ঠ রুদ্ধ থাকিলেও নয়নের ভাষায় তাঁহার যাহা জানিবার, তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন।

"সেই সপ্তাহেই আমি তাঁহার হইলাম;—প্রথম দর্শনেই আমি তাঁহার হইয়াছিলাম; কিন্তু সে লোক-চক্ষুর অগোচরে। পিতা সর্ব্বলোক-সমক্ষে শালগ্রাম ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে তাঁহার হাতে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহান্তে একপক্ষ পরে আমি আমার সেই আবাল্যের চির-পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া, জগতের একমাত্র অবলম্বন স্নেহময় পিতাকে ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইলাম। সুদীর্ঘ একটি বছর তাঁহার সহিত ভারতের নানা তীর্থে ঘুরিয়া আমরা এইখানে এই কাশীতে আসিলাম। দীর্ঘ-ভ্রমণের পর বিশ্রাম করিবার জন্যই এখানে কিছুদিন থাকিবার ব্যবস্থা হইল। তিনি একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া নানা আস্‌বাব-পত্রে সাজাইয়া লইলেন। বড় সুখে, বড় শান্তিতে এইখানে, আমার এই ভূ-কৈলাসে তিনটি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু মা, এ হতভাগ্য অদৃষ্টে এ সুখ বেশী দিন টিকিয়া রহিল না। একদিন সংবাদ পাইলাম, সংসারের একমাত্র অবলম্বন আমার স্নেহময় পিতা আর ইহ-জগতে নাই। আমার হৃদয়খানি শতধা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ধূলি-শয্যায় লুটাইয়া আমার পিতৃস্মৃতি স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সময় ত কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না; শোকও সময়ে হ্রাস হইয়া আসে। পিতার মৃত্যুশোক কিছুতেই সহিতে পারিব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু যে অলক্ষ্য হস্ত হইতে হৃদয়ে এই আঘাত পাইয়াছিলাম, সেই অলক্ষ্য হস্ত হইতেই শান্তিধারা বর্ষিত হইয়া আবার হৃদয় শান্ত করি। পিতা আমাকে এই বিশাল সংসারে একাকিনী ফেলিয়া গেলেন। তাঁহার অসীম ভালবাসায়,

আদর-যত্নে আমার নিরাশ ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। এই দুঃখময় শোকময় পৃথিবী পুনরায় নবীনতাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মা, এ ভাগ্যহীনার পোড়া অদৃষ্টে এ সুখ সহিবে কেন? আমার শান্তির আকাশে—সুখের আকাশে বৈশাখী কাল-মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল; কাহার সাধ্য, তাহার গতিরোধ করে? সহসা তাঁহার বক্ষে কি একটি ব্যথা ধরিল, ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে তাঁহার সেই দেবতা-বাঞ্ছিত সুন্দর নিটোল দেহখানি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল; ভয়ে চিন্তায় আমি এতটুকু হইয়া গেলাম। ডাক্তার ডাকাইলাম, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলাম,—কিন্তু কিছুই হইল না। একদিন তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে করিতে কহিলাম, 'চল, কলিকাতায় যাই, সেখানে বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ দিয়ে দেখান যাইবে।' তিনি উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মি, আমারও বড় সাধ হয়, মা'র কাছে ফিরে যাই, রণুকে দেখি, কিন্তু'—তিনি চুপ করিলেন। আমি তাঁহার অসম্পূর্ণ কথার অর্থ বুঝিলাম। আমার জন্তই কি তিনি গৃহে ফিরিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন? আমার জন্যই কি তিনি মাতা-পুত্রকে মুখ দেখাইতে লজ্জা অনুভব করিতেছেন? এম্নি স্বার্থপর! নিজের সুখেই বিভোর রহিয়াছি; এ কথা একবার মনেও করি নাই।

"আমি বলিলাম, 'তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছ? আমি তোমার সাথে গেলে যদি তোমার লজ্জা হয়, অপমান হয়, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যাইতে চাহি না। আমি রাজপুতানায় চলিয়া যাই।'—বলিলাম বটে, কিন্তু চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার চোখে জলের ধারা ছুটিল। তিনি সস্নেহে আমার মস্তক বক্ষে লইয়া, আমার অশ্রুপূর্ণ নয়নে চুম্বন করিয়া স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, 'ছিঃ লক্ষ্মি, তুমি আমাকে এতই কাপুরুষ মনে কর? আমি জীবনে মরণে কোন দিনও আমার ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিব না। তোমার কাছে গোপন করিব না, আমি বাড়ী যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু এই ভাবিয়া, আমার মা যদি তোমাকে ভিন্নদেশীয়া রাজপুতের মেয়ে ভাবিয়া স্নেহের চক্ষে না দেখেন; আমার পুত্র রণু যদি তোমাকে মা বলিয়া ভক্তি না করে। এ কথা আপন মনে ভাবিতেও আমার অসহ্য হয়। লক্ষ্মি, তোমাকে পাইয়া আমার লজ্জা হয় নাই, আমার গৌরব আরও বেশী হইয়াছে।' আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না; শুধু নত হইয়া আমার দেবতার চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইলাম।

"আশা নিরাশায় চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়ে একদিন তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইলাম। তখন আমার হৃদয়ে কি ঝড় বহিতেছিল, কে ব'লবে? তাঁহার পুত্র, তাঁহার মাতা আমাকে কি চক্ষে দেখিবেন, তাহার স্থিরতা কি? বৃহৎ থামযুক্ত প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিতেই, তিনি অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইলেন, 'লক্ষ্মি, এই তোমার নিজের বাড়ী চেয়ে দেখ।' আমি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য! ইহার

পূর্ব্বে তাঁহার আর্থিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এতটা কল্পনায় ভাবিতে পারি নাই। তিনি অন্তঃপুরের ফটকে গাড়ী থামাইতে গাড়োয়ানকে হুকুম করিলেন। গাড়ী থামিতেই চাহিয়া দেখি, দরজার সম্মুখে একটি মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে একটি অপার্থিব করুণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। অনুমানে বুঝিলাম, ইনি মাতা। পাঁচ ছয় বৎসরের একটি নধরকান্তি বালক প্রফুল্লমুখে গাড়ীর দিকে চাহিতেছিল। কি সুন্দর মুখ, ঠিক যেন উনির মত—জগতে অতুল্য, অমূল্য, নিখুঁত, নিটোল। উনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন; দুই বাহু প্রসারিত করিয়া রণুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মা একবার চকিত দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রমেশ, গাড়ীতে আর কে আছে?' চাহিয়া দেখি, তাঁহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের জন্য। তিনি রণুকে বক্ষ হইতে নামাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, 'যাও তো রণু, গাড়ীতে তোমার মা আছেন, তাঁকে নামিয়ে আন।' বালক প্রফুল্লমুখে 'মা মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার তৃষিতবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কি আনন্দে, কি সুখে আমার হৃদয়খানি প্লাবিত হইয়া গেল! আমি আমার তপ্তবক্ষে রণুর মুখখানি নিবিড় করিয়া ধরিলাম। বালক উচ্ছ্বসিত অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি এতদিন কেন তাহাকে ঠাকুরমার নিকটে ফেলিয়া 'বাপের বাড়ী' গিয়াছিলাম। অন্দরের নিভৃত কক্ষে অজস্র চুম্বনে আমি রণুর মন হইতে সমস্ত অভিমানরেখা মুছাইয়া দিলাম।

"মা'র স্নেহ-ভালবাসায় এবং রণুর আত্মসমর্পণ দেখিয়া ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টে কি এত সুখ সহিবে? এই শান্তিপূর্ণ গৃহের এত ঐশ্বর্য্য, এত স্নেহ-মমতা ভিখারিণী দীনা-হীনার ভাগ্যে সহিবে কেন? দেবী মায়ের দেবপুত্র, রণু আমার দেবশিশু; এই পাপ-পূর্ণ ধরায় কি তাহারা থাকিতে পারে? তাঁহার বক্ষের ব্যথা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিলে; কত ডাক্তার, কত কবিরাজ আসিল, কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি চলিয়া গেলেন; তাঁহার পদপ্রান্তে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমার নিকটে পৃথিবীর সমস্ত আলো চিরতরে নিবিয়া গেল। শান্তিস্রোত অর্দ্ধ-পথেই মরুভূমে পরিণত হইল, হৃদয় পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল, আমি পাষাণী তখনও মরিলাম না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন চাহিয়া দেখি, তিনি আর নাই; তাঁহার ছায়াটুকুও আর ইহলোকে দেখিতে পাইব না। আমাদের বহির্ব্বাটী হইতে একাধিককণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'বল হরি হরি বল।' আমি এ শব্দ সহিতে পারিলাম না। আমার বক্ষের ভিতর দিয়া, মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কি এক তাড়িত-শিখা বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার জ্ঞানহারা হইলাম। যাঁহাকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারি নাই, কখন যে পারিব, তাহাও ভাবি নাই, সেই তাঁহাকে হারাইয়া বাঁচিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বড় দুঃখে—বড় কষ্টে। জীবননদীতে অর্দ্ধপথেই চড়া পড়িয়া গেল, আমার পূর্ণিমারজনী দারুণ অমানিশার

অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বীণা বাজাইতে লইয়া তার ছিঁড়িয়া গেল, আমার বড় আনন্দের, বড় আশার ফুলবন হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইল। সব শূন্য, জগৎ শূন্য, তবুও আমি বাঁচিয়া রহিলাম।

"পুত্রশোকাতুরা জননী তাঁহার প্রস্থানের পর শয্যা গ্রহণ করিলেন,—সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা হইল। মাকে হারাইয়া আমি অকূলে ভাসিলাম; কোথায় দাঁড়াইব, কে আশ্রয় দিবে? মাথার উপরে বিপুল ঐশ্বর্য্য, আমি রমণী, আত্মীয়-বান্ধবহীনা; বালকপুত্র লইয়া কাহার নিকটে দাঁড়াইব ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলাম। বেশী দিন ভাবিতে হইল না। তাঁহার দূরসম্পর্কের মামা না কি কে, একদিন তাহার দলবল লইয়া বোঁচকা-বিড়ে লইয়া আমাদের গৃহে মৌরশী পাট্টা গাড়িয়া বসিল। তাহারা স্বামী স্ত্রী মিলিয়া দুই দিনেই বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নী সাজিয়া সংসারমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করিতে লাগিল। কাহার খবর কে লয়? নিজের অসহ্য যন্ত্রণায় রাত্রি-দিবা দগ্ধ হইতেছিলাম; উহাদের অভিনয় ভাল লাগিত না। মনে করিতাম, তাঁহার যাহা কিছু, সবই ত রণুর; উহারা ভোগ করিবে; দুই দিন বই ত নয়—করুক। কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গিতে বেশী দিন লাগিল না; বুঝিলাম, রণুকে উহারা বিষতুল্য দেখিতেছে। আহা, পাষণ্ডদের ভিতরে বুঝি কিছুই ছিল না; তাহাদের শরীরগুলি বুঝি বিধাতাপুরুষ রক্তমাংসের পরিবর্ত্তে লোহা দিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। আমার সোনার রণু উহাদের তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে দিনে দিনে নিদাঘে দগ্ধ ফুলটির মত শুকাইতে লাগিল। মনে করিলাম, এ সয়তানদের হাত হইতে রণুকে লইয়া কোথায়ও পলাইয়া যাই। কিন্তু যাইব কোথায়? জগতে কাহাকেও ত রাখি নাই যে, তাহার আশ্রয়ে যাইব। মনে করিলাম, রণুর হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। আমার ভিক্ষান্নে রণুকে বাঁচাইয়া রাখিব। মনে ভাবিলাম বটে, কিন্তু পারিলাম কই? তখনও এ দেহে রূপযৌবন তাহার পূরা রাজত্ব করিতেছে; তাই পথে বাহির হইতে পারিলাম না। চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করিলাম, সয়তানেরা ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল করিল। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কণ্টকস্বরূপ রণুকে এ পৃথিবীতে রাখিতে দিল না। তাহারা আমার বাছাকে একটু একটু করিয়া দিনে দিনে হত্যা করিল। বেলা-শেষের ঝরা ফুলটির মত রণু আমার, তাহার মায়ের বুকে ঝরিয়া পড়িল। মা গো, আর কি শুনিবে? আমি রণুকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু পারিলাম না। সেই পাপাত্মা হরলাল, তাঁহার মামাতো ভাই না, কি, সেই বিকটদর্শন নরকের কীট, তাহার লালসাপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া আমার বক্ষ হইতে আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি, কণ্ঠের হার, এ অনাথার সর্ব্বস্ব রত্ন ছিনাইয়া লইয়া গেল। জোর করিয়া পারিলাম না। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুটিয়া গেলাম; দেয়ালের ধাক্কা খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম; উঠিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। শুনিলাম, পাষণ্ডেরা উচ্চ চীৎকারে

বাড়ী কাঁপাইয়া 'বল্ হরি হরি বল্' বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেল। অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের ঐ বিকটধ্বনি আমার বক্ষ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে বিঁধিতে লাগিল। সেই দিন হইতে ও নাম আর শুনিতে পারি না, মা। ঐ কথা শুনিলেই আমি জ্ঞানহারা হইয়া যাই। আমার নয়নের সম্মুখে আমার প্রিয়তমের অন্তিমশয্যা, আমার প্রাণাধিক পুত্রের চিরবিদায় ছবির মত ভাসিয়া ওঠে। ঐ হৃদয়হীনেরা এ কথা জানে না, তাহারা তামাসা বলিয়া আমার হৃদয়খানি আরও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

"মা, তোমাকে সমস্তই বলিলাম, আর শেষটুকুই বা বাকী থাকিবে কেন? সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভাবিলাম, পতিপুত্রের স্মৃতিমন্দিরে তাহাদের মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব। কিন্তু এ ভাগ্যবিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতার সব পথই রুদ্ধ। সব আশাই আকাশ-কুসুম। নরকের কীট হরলালের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার অনুসরণ করিয়া বেড়াইত; কিছুতেই গৃহে টিকিতে পারিলাম না। পাড়ার এক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা কাশীবাসিনী হইবেন শুনিয়া তাঁহারই নিকটে কাঁদিয়া পড়িলাম। তিনি আমার সমস্ত কথা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার সাথে আনিলেন। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন। দশ বার বছর তাঁহার কাছে নিরাপদেই কাটাইয়াছি। আমার অদৃষ্টে দুই বৎসর হইল, তাঁহার কাশী-প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে সেই গৃহেই আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের অন্ন গ্রহণ করি না। ছত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাতেই আমার একবেলার হবিষ্যান্ন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

ইচ্ছা করিলে তাঁহার ধনরত্ন অনেক সাথে করিয়া আনিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আনি নাই। জগতের যে অমূল্য অতুল্য রত্ন, তাহাই হারাইয়াছি; তুচ্ছ ধন, ঐশ্বর্য্য, তাহা দিয়ে কি হইবে? তাঁহার প্রীতি-উপহার গহনাগুলি আমার বড় আদরের, তাঁহার বড় মনোনীত করিয়া তৈরী, তাই সেগুলির মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলাম না। তাঁহার দান আমার বড় আদরের; সেগুলি বেচিলে আমার মত পাঁচটি বিধবার চির-জীবন কাটিতে পারিত। আমি ভিখারিণী, আমার রত্ন দিয়ে কি হইবে? আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের গহনাগুলি আতুরাশ্রমে দান করিয়াছি।

ধীরে ধীরে রমণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি অঞ্চলের প্রান্তে বার বার চক্ষু মুছিয়াও চোখের জল সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া চাহিলাম, সে তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাৎ হইতে ধ্বনি হইতেছিল, "বল্ হরি হরি বল্।"

শ্রীগিরিবালা দেবী।

ঠাকুর হরিদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফুলিয়ায়

ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে সুরধুনী ভিন্নপথগামিনী। শান্তিপুরের ন্যায় ফুলিয়াও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্থান—বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ব্রাহ্মণ-সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন "ফু'লের মুখুটি"দিগের আদি বাসস্থান এই ফুলিয়া। আর, যিনি সরল-সুললিত পদ্যে রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষাকে এক অপূর্ব্ব মৃত-সঞ্জীবনী-রসে সরস করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের সেই অমর-কবি অক্ষয়-কীর্ত্তি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি এই ফুলিয়া। ঠাকুর-হরিদাসের শান্তিপুরে অবস্থানকালে তাঁহার সুনাম শুনিয়া ফুলিয়া-সমাজের ব্রাহ্মণ-গণমধ্যে অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহার ভজন শুনিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিতেন। অধুনা তাঁহাকে স্বগ্রামে পাইয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, হরিদাস ঠাকুর যথার্থ সাধু, যথার্থ ভক্ত।

"ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল,
সবেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল।
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস,
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস।"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ঠাকুর হরিদাসকে একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, রামদাস পণ্ডিত তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। ইনি সুপণ্ডিত, ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণের একান্ত ভক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ একদিন বিনীতভাবে হরিদাসকে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি সাধু, আপনার এ স্থানে আগমনে আমরা ধন্য হইলাম। না জানি, এ গ্রামের কত পূর্ব্ব-সুকৃতি ছিল। যে স্থানে একজন সাধুব্যক্তি বাস করেন, সে স্থান পবিত্র হইয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, বড়ই আনন্দের কথা। এ স্থানে কিছুকাল বাস করুন।"

"তহি রামদাস নামে সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা সদা ধর্ম্মপরায়ণ।
হরিদাসে দেখি তাঁর ভক্তি উপজিল,
দৈন্য করি মিষ্টভাষে কহিতে লাগিল—
সাধু তুয়া আগমনে মোরা হৈনু ধন্য,
না জানি গ্রামের কত ছিল পূর্ব্ব-পুণ্য।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"দ্বিজবর! আমাকে যে ওরূপ বলিতেছেন, ইহাতে আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি অস্পৃশ্য, নীচ জাতি। আপনারা ব্রাহ্মণ। বেদ বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকলেবর। আমি যে আপনাদিগের সঙ্গ পাইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে—ওহে দ্বিজবর,
বেদোক্তি ব্রাহ্মণ মাত্রে বিষ্ণুকলেবর।
মুঞি নীচ জাতি হও নহে স্পর্শযোগ্য,
তুয়া সঙ্গ পাইনু মোর এই মহাভাগ্য।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

পণ্ডিত রামদাস বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি পরম ঈশ্বর-ভক্ত, সাধু। আপনি এই প্রকার দৈন্য করিতেছেন কেন? যিনি ঈশ্বরানুরাগী, তাঁহার জাতির গণনা হয় না। স্পর্শমণির স্পর্শ পাইলে যেমন লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহার সহিত ঈশ্বরোপাসনার সংযোগ হইয়াছে, তিনি যে বর্ণই হউন না কেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।"

"রামদাস কহে সাধু কাহে কর দৈন্য,
ঈশ্বরানুরাগী জনের জাতি নহে গণ্য।
যৈছে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ হয় স্বর্ণ,
ঈশ্বরোপাসনে তৈছে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববর্ণ।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

ইহার পর উভয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বশেষে বলিলেন যে, যিনি সর্ব্বেশ্বর, সেই শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, একমাত্র ভক্তিই তাহার পন্থা। জ্ঞানযোগে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মাত্র অনুভূত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে ভক্তি ভিন্ন

পাওয়া যায় না। ভক্তিলাভের উপায় হরিনাম। অবিশ্রান্ত হরিনাম-জপে প্রেমধন লাভ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে ভক্তিযোগ সার,
তাহে লভ্য হয় নিত্যব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর।
নিত্য ব্রহ্মবস্তু হয় স্বয়ং ভগবান্,
সচ্চিৎ আনন্দময় সর্ব্বশক্তিমান্।
হরিনাম হয় শুদ্ধভক্তির কারণ,
অবিশ্রান্ত জপে পায় নিত্য প্রেমধন।"
(শ্রীঅঃ প্রঃ)

পণ্ডিত রামদাসের মনে ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে প্রথম দর্শনেই একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, সিদ্ধ মহাপুরুষ। সুতরাং ঠাকুরের কথা ব্রাহ্মণ অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিলেন। হরিদাস ফাঁকা কথা কহেন নাই। প্রত্যেক কথাই তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ কথা। এজন্য তাঁহার প্রতি কথায়ই শক্তি ছিল। সেই শক্তির সঞ্চারে ব্রাহ্মণ রোমাঞ্চিত-কলেবরে ঠাকুর হরিদাসের স্থানে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু যিনি তৃণাদপি সুনীচ, যিনি সকলের নিকট হাত যোড় করিয়াই আছেন, এমন যে বিনয়ের বিগ্রহস্বরূপ হরিদাস ঠাকুর, তিনি কি একজন সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে—তাঁহার গুরু হইতে স্বীকৃত হইবেন? ইহা ধারণাযোগ্য নয়! কিন্তু ঠাকুর সেই স্থলেই এবং সেই ক্ষণেই কি এক ভাবের আবেশে ব্রাহ্মণকে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক হরিনাম প্রদান করিলেন।

"শুনি দ্বিজ হঞা রোমাঞ্চিত-কলেবর,
কহে মোরে দয়া করি করহ সংস্কার।
তাহা শুনি হরিদাস প্রেমে পূর্ণ হঞা,
হরিনাম দিলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া।"
(শ্রীঅঃ প্রঃ)

সাধুমহাপুরুষদিগের চেষ্টা-চরিত্র, গতিবিধি সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অনধিগম্য। নির্জ্জন স্থানই ঠাকুর হরিদাসের প্রিয়, এবং নির্জ্জনে রহিয়াই তিনি আপন কুটীরে বসিয়া নিরন্তর হরিনাম জপ করিতেন, এত দিন আমরা তাহাই দেখিয়াছি, ফুলিয়ায় আসিয়া কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এখন হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলেন। হরিদাস ঠাকুর কখনও ফুলিয়ায়, কখনও বা শান্তিপুরে,

এইরূপে নিরবধি সুরধুনীর তীরে তীরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হন, তখন উভয়ে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন এবং এমন হুঙ্কার-গর্জ্জন করেন যে, তাহাতে যেন গোলোকের আসন পর্য্যন্ত টলিয়া উঠে। আর সুরতরঙ্গিণী কোটি তরঙ্গ বিস্তার করিয়া যেন আপনার আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন।

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে,
ভ্রমেন কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে।
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি,
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে,
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর পরম ত্যাগী, পরম বৈরাগী—বৈরাগীর শিরোমণি, নিষ্কাম-ভক্তিযোগী। অষ্টপ্রহর গোবিন্দ নাম মুখে উচ্চারিত হইতেছে, ক্ষণেকের তরে তাহার বিরাম নাই। হরিনামগ্রহণের, হরিনামকীর্ত্তনের চরম ফল যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, তাহা তাঁহার লাভ হইয়াছে। নাম করিতে করিতে অষ্ট সাত্বিক ভাব আসিয়া তাঁহার দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—তিনি আর স্ববশে থাকেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতরে যে কি হয়, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু লোকেরা দেখে যে, তিনি কখনও নৃত্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও গভীর গর্জ্জন, আর কখনও বা অট্টহাস্য করিতেছেন! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে কালযাপন করিতেছেন।

"কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি,
কখন করেন মত্ত সিংহপ্রায় ধ্বনি।
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন,
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন।
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম,
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম।
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে,
সকলি আসিয়া তাঁর শ্রীবিগ্রহে মিলে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কাজীর অত্যাচার

তখনকার দিনে স্থানে স্থানে বিচারকর্ত্তা ছিলেন কাজী। "কাজীর বিচার" বলিলে আজকাল লোকেরা যাহা বুঝে, তখনকার কাজীর বিচার ঠিক তেমনই ছিল। তখন নবদ্বীপের কর্ত্তা ছিলেন চাঁদ কাজী, আর শান্তিপুরের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা ছিলেন গোড়াই কাজী। ঠাকুর হরিদাস মুসলমান-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, বিশেষতঃ কাজী সাহেবের নিজের এলেকার মধ্যেই আসিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতেছেন, গোড়াই কাজীর তাহা সহ্য হইল না। হরিদাস ঠাকুরকে অতি গুরুতর শাস্তি দিবার জন্য কাজী একেবারে গৌড়ে যাইয়া বাদশাহের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে—

"গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম,
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান।
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

গৌড়াধিপতি হোসেন শাহা এই অভিযোগ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং আপনার খাস-দরবারেই হরিদাসের বিচার করিবেন বলিয়া ইস্তাহার জারি করিলেন; ইহার কয়েক দিন পরেই ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ফুলিয়ায় পাইক-বরকন্দাজ আসিল। যিনি সকল ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন—গোবিন্দ-চরণে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবার কিসের ভয়? পাইক-বরকন্দাজ, কাজী-বাদশার কথা দূরে থাকুক, যমের ভয়ও তিনি রাখেন না। নিত্য-যুক্ত হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পাইকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ফুলিয়া গ্রাম বিষাদে ডুবিল। এই সময়ে অদ্বৈতপ্রভু বোধ হয় নবদ্বীপে।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়,
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে,
মুলুকপতির আগে দিল দরশনে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর যে দিন গৌড়ে পৌছিলেন, সে দিন তাঁহাকে বন্দিখানায় রাখা হইল। পরদিন তাঁহার বিচার। নানা শ্রেণীর বন্দিগণ বন্দিশালায় রহিয়াছে। তাহারা

সকলেই ঠাকুর হরিদাসের অসামান্য উজ্জ্বল দেহ-প্রভা দেখিয়া তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাঁহার দর্শন-প্রভাবে ও তাঁহার মুখের হরিনাম শ্রবণে মহামহা অপরাধীদিগেরও প্রাণ ভক্তিরসে সিক্ত হইল। তাহারা যে কারাগারে রহিয়াছে, ক্ষণেকের তরে সে কথা ভুলিয়া গেল, চিত্তে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বন্দিগণ আপন-আপন স্থানে রহিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

"রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া,
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্ট হৈয়া।
আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-নয়ন,
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম।
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার,
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে পরের মাথায় লাঠি মারিয়াছে, কেহ বা জাল-জুয়াচুরি করিয়া অপরের সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধিগণেরও চিত্ত তৎকালে ভক্তিরসে বিগলিত হইতে দেখিয়া ঠাকুর হরিদাস আনন্দিত হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে সকলকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, আর যেন ইহারা বিষয়-পঙ্কে নিমগ্ন না হয় এবং ইহাদিগের প্রাণের এই নির্ম্মল অবস্থা, এই ভক্তির ভাব যেন স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে একটু রঙ্গ করিয়া বলিলেন--"তোমরা এখন যে ভাবে আছ, সকলে সেই ভাবেই থাক।"

"তা সবার ভক্তি দেখি ঠাকুর হরিদাস,
বন্দিগণ দেখিয়া পাইলা কৃপা-হাস।
থাক থাক এখন আছহ যেরূপে,
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর বড় রঙ্গী ছিলেন। সদানন্দ পুরুষ, কারাগারে আসিয়াও রঙ্গ। বন্দিগণ ঠাকুর হরিদাসের কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদকে অভিসম্পাত জ্ঞান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইল।

"না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞের বচন,
বন্দী সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস তাহাদিগের মুখের ভাব দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং সহাস্তে বলিলেন—

"বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি,
বিষয় পাসর, অহর্নিশ বল হরি।
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সবাকার মন,
যেন আছে এই মত থাকুক সর্ব্বক্ষণ।
ছলে করিলাম এই গুপ্ত আশীর্ব্বাদ.
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

গৌড়ের দরবারে

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঠাকুর হরিদাসের চেহারাতে অসাধারণ কিছু ছিল—একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহা বিরোধী লোকের প্রাণও আপনা হইতেই সম্ভ্রমে নত হইত। মুলুকের অধিপতি হোসেন শাহা আজ পূরা দরবারে উজীর, নাজীর, মোল্লা, মৌলবী ও দেশের বড় বড় কাজী ও মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট। আজ ঠাকুর হরিদাসের বিচার হইবে। সে বিচার দেখিবার জন্য দরবার-গৃহ লোকে লোকারণ্য। ঐ যে হরিদাস ঠাকুর আসিতেছেন—বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, মুখে অবিরাম তারকব্রহ্মনাম। সেই অসাধারণ বন্দী আপন প্রভাবে সকলের চিত্ত চমকিত করিয়া বিচার-মঞ্চে উপনীত হইলেন। কিন্তু বড় বিস্ময়ের কথা যে, হোসেন শাহা তাঁহাকে সম্মানের সহিত আপন পার্শ্বে আনিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন। দরবার শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত।

"অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান,
পরম গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকের পতি বোকা ছিলেন না। হোসেন শাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই আসামী সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ইঁহার প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করিলে সহস্র সহস্র লোক সরকারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু যদি মিষ্ট কথায় বলিয়া-কহিয়া তাঁহার মন ফিরান যায়, যদি তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কলমা পড়িয়া পুনরায় পবিত্র যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সর্ব্বোত্তম হয়। প্রথমে সেই নীতিই অবলম্বন করা

কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি তাঁহার মতিগতি না ফিরে, তবে শাস্তি দেওয়া ত নিজের হাতেই আছে। তাই তিনি ঠাকুর হরিদাসকে আপন বুদ্ধি অনুসারে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া অনেক কথা বলিলেন।

"আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুলুকের পতি—
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি?
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ-জাত।
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার,
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার?
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার,
সে পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মায়া-মোহিত মুলুকপতির কথায় হাস্য করিয়া ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"অহো! বিষ্ণুমায়া!"

"শুনি মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস,
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহা হাস।"

ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ! মতান্তরে এত মনান্তর! যিনি এক নিত্য সত্য অখণ্ড অব্যয় পুরুষ, সকলে তাঁহারই উপাসনা করে, সেই একেরই আরাধনা করে। কোরাণপুরাণ সমস্বরে সেই এক অব্যক্ত চিন্ময় পুরুষকেই নির্দ্দেশ করে, নামে মাত্র ভেদ। যাঁহার যেমন অধিকার, যাঁহার যেমন রুচি, তিনি সেই অধিকার, সেই রুচি লইয়া ভগবান্‌কে ডাকেন। কেহ আল্লা বলেন, কেহ বা হরি বলেন। ফলতঃ ডাকেন একজনকেই। এই কথাটা না বুঝিয়াই জীব আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, ইত্যাকার সাম্প্রদায়িক মতামত লইয়া কেবল কোলাহল করে। ইহা ভাবিয়াই হরিদাস ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"অহো! বিষ্ণুমায়া!" অতঃপর তিনি মুলুকপতির কথার উত্তরে মধুরকণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় জ্ঞান-গম্ভীর স্বল্প কয়েকটিমাত্র কথা বলিয়া উপবেশন করিলেন।

"বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর,
শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু যবনে,
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়,
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন,
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে,
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস আরও বলিলেন—"যিনি তোমার আমার সকলেরই ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং আমার প্রাণে বসিয়া যেমন প্রেরণা করিতেছেন, তদ্রূপই আমি করিতেছি। ইহাতে যদি আমার কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহার বিচার করিয়া আমাকে শাস্তি দিতে হয় দাও, আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি।"

"সরাসর এবে তুমি করহ বিচার,
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কথা ত সকলেই বলে। কিন্তু বলার তারতম্য আছে। একই কথা, একই শব্দ তুমি আমি যখন উচ্চারণ করি, তখন দেখি যে, তাহা যেন লঘুর লঘু হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়। আবার সেই কথাই যখন শক্তিমান্ ব্যক্তির রসনায় উচ্চারিত হয়, তখন উহা যেন শক্তিতে ভারি হইয়া গুরুর গুরু হইয়া লোকের প্রাণে যাইয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করে। ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছিলেন কেবলমাত্র ঐ কয়েকটি সাধারণ সত্যকথা। কিন্তু তাঁহার কথায় শক্তি ছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া যবনেরা মোহিত হইল। স্বয়ং মুলুকপতিও যেন একটু সন্তোষের ভাব ব্যক্ত করিলেন। ভাব-গতিক দেখিয়া আমাদের সেই গোড়াই কাজী মহাশয় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—এই বুঝি শীকার পলায়, বুঝি বা আসামী খালাস পায়। এ পাপী অব্যাহতি লাভ করিলে এই এক দুষ্টে কত জনকে দুষ্ট করিবে, পবিত্র যবন-কুলে কলঙ্ক আনয়ন করিবে। কাজী অতিশয় দৃঢ়তার সহিত মুলুকপতিকে বলিলেন—"বাদশানামদার! আমার আরজ এই যে, হয় এ ব্যক্তি কলমা উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় যবন-ধর্ম্মে প্রবেশ করুক, না হয়, ইহাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক। তাহা না হইলে যবনের মান-সম্ভ্রম আর থাকিবে না।"

"হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল যবন।
সবে-এক পাপী কাজী, মুলুকপতিরে
বলিতে লাগিলা—শাস্তি করহ ইহারে।
এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক,
যবনকুলে অমহিমা আনিবেক।
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভালমতে,
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকর যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন হোসেন শাহার তাহা ভাল লাগিয়াছিল। প্রাণে একটু কোমলভাবও আসিয়াছিল। কিন্তু আবার গোড়াই কাজীর উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্যে বাদশাহের মনের গতি অন্যদিকে ফিরিল। এবারে তিনি নরম-গরম সুরে একটু সমজাইয়া, একটু শাসাইয়া বলিলেন –

"পুনঃ বলে মুলুকের পতি—আরে ভাই,
আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।
অন্যথা, করিবে শাস্তি সব কাজীগণে,
বলিলাম, পাছে আর লঘু হবে কেনে?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যবন-রাজার চক্ষে ঠাকুর হরিদাসের অপরাধ অতি গুরুতর। তাহাতে আবার শাস্তি দিবেন কাজীর দল মিলিয়া। অর্থাৎ দরবারে উপস্থিত কাজীরা যে দণ্ড নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাই ঠাকুর হরিদাসকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং নিশ্চয়ই প্রাণ-দণ্ড অথবা তত্তুল্য কোনও একটা দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, এই সহজ কথাটা হরিদাস ঠাকুর অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভাবনা ভাবিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রাণের ভয়ে হরিনাম ছাড়িয়া কলমা পড়িতে হইবে—তোবা তোবা বলিতে হইবে, ইহা কি ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা সম্ভবে? প্রাণ ছাড়া যায়, কিন্তু হরিনাম ছাড়া যায় না, ইহাই হরিদাস ঠাকুরের প্রাণের কথা। মহাপুরুষদিগের চিত্ত এক দিকে যেমন কুসুম হইতেও সুকোমল, তদ্রূপ অন্যদিকে বজ্রাপেক্ষাও কঠোর। যাঁহারা ভাবেন যে, কৃষ্ণভক্ত হইলেই মানুষ ভীরু কাপুরুষ হয়, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত, বোধ হয়, তাঁহারা কৃষ্ণভক্ত দেখেন নাই। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত একদিকে যেমন তৃণাদপি সুনীচ, তেমনই আবার অপরদিকে সাক্ষাৎ তেজের বিগ্রহ—জলন্ত পাবক।

ভক্ত প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করুন। যিনি মহান্ হইতেও মহান্, গরীয়ান্ হইতেও গরীয়ান্, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অভয়পদে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার ভয়?

সেই ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নির্ভীক হরিদাস ঠাকুর মহাতেজের সহিত মুলুকপতির কথার উত্তরে বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই—যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণবের তেজ দেখিয়া দরবার শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল। ঠাকুর হরিদাসের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই গম্ভীর ধ্বনি সর্ব্ব-চিত্ত চমকিত করিয়া তাহাদিগের কানে ও প্রাণে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

মুলুকপতির মুখের উপর এত বড় জোরের কথা আজ পর্য্যন্ত আর কেহ বলে নাই। বলা বাহুল্য যে, হোসেন শাহা হরিদাস ঠাকুরকে অতি কঠোর শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং কাজীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"এমন ব্যক্তিকে আপনারা এক্ষণে কি দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন?" কাজীগণের মুখপাত্র জবরদস্ত গোড়াই কাজী দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমাদের বিচারে এই কাফেরের উপযুক্ত দণ্ড এই হয় যে, এই ব্যক্তিকে একে একে বাইশটি বাজারে লইয়া গিয়া প্রত্যেক বাজারে সর্ব্বসমক্ষে মনের ঝাল মিটাইয়া ইহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বেত্রাঘাত করা এবং এই প্রকারেই ইহার পাপ-জীবনের অবসান করা। বাইশটি বাজারে প্রহার খাইয়াও যদি না মরে, হাঁ, তবে বুঝিব যে, এ ব্যক্তি জ্ঞানী বটে, এ যাহা বলে, তাহা সত্য।"

"কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি,
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি।
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জীয়ে,
তবে জানি জ্ঞানী, সব সাচা কথা কহে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকপতি কাজীর রায়েই রায় দিলেন, এবং যমদূতের মূর্ত্তিস্বরূপ পাইকদিগকে ডাকিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিয়া দিলেন,—"ইহাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া এমন প্রহার

করিবে, যেন প্রহারে-প্রহারেই ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যবন হইয়া যে ব্যক্তি হিন্দুয়ানি করে, এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"

পাইকেরা পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়া কেবল একটা হুকুমের অপেক্ষা করিতেছিল। হুকুম পাইবামাত্র, মনের আক্রোশ মিটাইয়া উহা তামিল করিবার নিমিত্ত উহারা ঠাকুর হরিদাসকে দৃঢ়রূপে রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল। ইহার পর যে লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল, সেই মর্ম্মবিদারিণী ব্যথার কাহিনী বর্ণন করিতে লেখনী অক্ষম।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে,
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহা ক্রোধমনে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস,
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ।
দেখি হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার,
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার।
কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্বরাজ্য,
সে নিমিত্ত সুজনেরে করে হেন কার্য্য,
রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে ক্রোধ-মনে,
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে।
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে,
কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে।
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে,
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধমনে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাসের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া শত-সহস্র লোক হায় হায় করিতে লাগিল, সকলের প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা যবনগণের পায়ে পড়িয়া কত কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল,—"তোমাদিগকে অর্থ দিব, তোমরা ঠাকুরকে কিছু কম করিয়া মার।" কিন্তু পাইকেরা আরও জোরে বেত চালাইতে লাগিল। কিন্তু যাঁহাকে এত করিয়া মারিতেছে, তাঁহার অবস্থা কি? তিনি এত প্রহারে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন? আর কেমন করিয়াই বা এরূপ নির্ম্মম বেত্রাঘাত সহিতেছেন? প্রতি আঘাতে রক্ত ছুটিতেছে! আর সেই প্রতি শোণিতবিন্দু হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের কনক-কান্তিতে উজলিয়া যেন হাসিয়া বলিতেছে—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

এত প্রহারেও ঠাকুর হরিনাম ছাড়েন নাই। ঐ দেখ, ঐ দেখ, পাষণ্ডেরা কেমন করিয়া ঠাকুরকে মারিতেছে! আর দেখ, ঠাকুর এখনও কেমন প্রসন্ন-বদনে হরিনাম করিতেছেন। ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণের প্রসাদে নামানন্দে আপনার আত্মাকে যেন দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন, প্রাণে কোনও ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে,
অল্প দুঃখ না জন্ময়ে এতেক প্রহারে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কিন্তু একমাত্র দুঃখ, ইহাদের গতি কি হইবে?—হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো। ইহাদেরে কৃপা কর, ইহাদেরে কৃপা কর। ঠাকুর! ইহাদের অপরাধ লইও না—কেবল এই প্রার্থনা, এই আশীর্ব্বাদই ঠাকুর হরিদাসের প্রাণে জাগিতেছে।

"সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে,
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে।
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত একটা ধর্ম্মের কেন প্রয়োজন হইয়াছিল? 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—

১) ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে অত্যন্ত ব্যভিচার চলিতেছিল।

২) ১৮শ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

৩) এই ব্যভিচার ধর্ম্মের আবরণে ও দেবদেবীগণের নামের অন্তরালে অবাধে প্রশ্রয় পাইতেছিল।

৪) কাজেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা একটা অপরিহার্য্য সামাজিক প্রয়োজন বশতঃ ঘটিয়াছিল।

৫) আর সকলেই জানেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাই—ব্রাহ্মধর্ম্ম।

এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি গতবারে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গলা সাহিত্যকে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া—যাঁহারা অত্যন্ত জঘন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুই তাঁহাদের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় নহেন। ইহা স্পষ্ট করিয়া বলাই আবশ্যক; নতুবা আশঙ্কা হয়, দীনেশ বাবুর উপর সুবিচার করা হইবে না। সাহিত্যে যখন কোন মিথ্যা বা অর্দ্ধ-সত্যপূর্ণ মতবাদ একমাত্র ধ্রুব সত্যের স্থান অধিকার করিয়া, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের যোগসাজসে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইবার উদ্যোগ করে, তখন তাহার প্রতি-ষেধকল্পে যে চেষ্টা, তাহাও একটা সামাজিক প্রয়োজনে সম্ভূত মনে না করিবার কোন যথেষ্ট কারণ নাই। সাহিত্যে ভ্রান্ত মতবাদ একের হউক, একাধিকের হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই ভ্রান্ত মতবাদ শুধু দীনেশ বাবুর না হইয়া যদি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হয়,—যদি পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হয়, তাহা হইলেই বা আমাদের উপায় কি? সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরা বস্তুতঃই অনন্যোপায়।

১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গলার সমাজচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয়ও দীনেশ বাবুর সহিত প্রায় একমত। এমন কি, ১৮শ শতাব্দীর সামাজিক দুর্গতির জন্য ইহাঁরা উভয়েই একই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—আর বলা বাহুল্য, ১৯শ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়াও ইহাঁদের একের অন্য হইতে কোন স্বাধীন বা সতন্ত্র মত নাই। কেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তথাপি আমরা যে বিচলিত হই নাই, ইহা বলা প্রয়োজন মনে করি।

শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু বলেন,—"মুসলমানী কেচ্ছার কলুষ-স্রোতের মুখে পড়িয়াই বঙ্গ-সাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল।" শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"মুসলমান রাজাদিগের রাজ-সভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্ব্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত—ইত্যাদি।" ১৮শ শতাব্দীর সাহিত্য ও সমাজ যে কলুষিত হইয়াছিল, মুসলমানই তাহার কারণ। ইহাই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের সিদ্ধান্ত;—এবং ইহাই 'ব্রাহ্ম-সমাজের' ইতিহাস-লেখকের অভিমত। হইতে পারে, ইহা আংশিকভাবে সত্য; কিন্তু ইহাই কি একমাত্র সত্য?

বাঙ্গলার মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চায় মনোযোগী হইতেছেন। আশা করা যায়, তাঁহারা অচিরেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যগুলিকে সমালোচনা-সাহিত্যে তুলিয়া ধরিবেন। ইতিমধ্যেই এরূপ দু'একটা সমালোচনা আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে। "তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে" মাননীয় সৈয়দ এম্‌দাদ আলী কর্ত্তৃক পঠিত "কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী?" শীর্ষক প্রবন্ধটি মুসল-মানের পক্ষসমর্থনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা।

১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে নাকি নায়ক-নায়িকার অবৈধ সংস্রব ঘটাইবার জন্য একশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দৌত্য করিত। ইহাই ক্রমে তাহাদের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। সমাজে ও সাহিত্যে এই কুট্‌নী-প্রথা নাকি মুসলমানদিগের আমদানী। মাননীয় সৈয়দ এম্‌দাদ আলী দেখাইতেছেন যে—

ক) কুট্‌নী-প্রথা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির ফলে এ দেশে স্থান পাইয়াছিল।

খ) "সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যই ইহার মূল প্রস্রবণ।"

গ) "আর দীনেশ বাবু যাহা এখন অশ্লীল বলেন, তাহা সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরবের দিনে—অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইত না।"

ইহা নিশ্চিতই দীনেশ বাবুর মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা; এবং ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে, এমন সমালোচনা।

আমাদের মনে হয়, ১৯শ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমর্থন করিবার জন্য ১৮শ শতা-ব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালীর ধর্ম্ম এবং বাঙ্গালীর সাহিত্যকে অতিশয় নিদারুণ-ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। যাহা ১৮শ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে ছিল, তাহা কেবল এক ১৮শ শতাব্দীর অমার্জ্জনীয় পাপ ও কলঙ্ক বলিয়া চিত্রিত করিলে যে শুধু কিছুকালের জন্য

সত্যের অপলাপ হয়, তাহাই নহে, যে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহা করা হয়, অন্ততঃ শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছেন, সেই রাজা রামমোহনের আগমনের পথ ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পথও যে বিশেষ সুগম হয়, আমাদের ত তাহা মনে হয় না। কুট্‌নী-প্রথা ১৮শ শতাব্দীতে ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতেও আছে। ১৯শ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-যুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা একটু রকমফের করিয়া—একটু ভোল বদ্‌লাইয়া, কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে পারেন; কেননা, এ বিষয়ে তাঁহার একটা গবেষণা আছে—একটা সিদ্ধান্ত আছে। আর সংস্কার-যুগের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে গিয়া রাজনারায়ণ বাবুর সিদ্ধান্তকে কে উপেক্ষা করিবে?

১৮শ শতাব্দীতে জাতির রাষ্ট্রজীবনে এক ঘোর অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্রীয় হিসাবে ইহা একটা পতনের যুগ। সেই যুগের যাহা কিছু ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সমাজে মন্দ, তাহাকেই ১৯শ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতিকে নাকচ করা ভিন্ন আর কি?

১৮শ শতাব্দীর ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সমাজে যাহা নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যাহা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় পরিকল্পিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা সমস্তই আছে, একটু মুখচ্ছবির পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—তাহাও সর্ব্বত্র নহে। ১৯শ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্ম, বাঙ্গালীর ১৮শ শতাব্দীর ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজকে কোথায় যে সংস্কৃত করিল, আমরা ত এত অন্বেষণ করিয়াও তাহার নিদর্শন পাইতেছি না। ১৮শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিল সেই ব্যভিচার দূর করিতে; কিন্তু ব্যভিচার লুকাইয়াছিল 'দেবদেবীর আবরণে'; সুতরাং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, সুতরাং রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র,—সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, এবং—সুতরাং—ইত্যাদি। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু বলেন, পানদোষ ও বেশ্যাগমন এ কালে বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু হিন্দু ও ব্রাহ্মতে কোন পার্থক্য করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার উক্তি বা লেখাতে কোন স্থানে পাঠ করি নাই।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, সেকালে "কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—'ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন'—এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মান-সম্ভ্রমের কারণ ছিল।" সমাজে যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহা মান-সম্ভ্রমের কারণ ছিল, সে শ্রেণীর মধ্যে এখনও তাহাই আছে। যদিও আমি বলিব না যে, কোনও কালেই সমাজে ইহা মান-সম্ভ্রমের কারণ হওয়া সঙ্গত। যাহা ১৮শ শতাব্দীতে ছিল, যাহা ১৯শ শতাব্দী ধরিয়া দূর করিতে পার নাই—

বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া তাহাকে কেবল ১৮শ শতাব্দীর দোষ, কেবল হিন্দু-ধর্ম ও সমাজের দোষ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কি অধিকার তোমার আছে? ব্যভিচার ১৮শ শতাব্দীতে আছে, আর ১৯শ কিংবা বিংশ শতাব্দীতে কি নাই? সাহিত্যের অশ্লীলতা—ভারতচন্দ্রে আছে,আর বলিতে চাও কি—রবীন্দ্রনাথে নাই? সমাজের অশ্লীলতা,—হিন্দু-সমাজে আছে, আর বলিতে চাও কি—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবপন্থীদের সমাজে ব্যভিচার নাই? তবে ভদ্রলোকদের ভিতর, তা হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সমাজেই পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিবার সময়—রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ীর প্রসঙ্গ তুলিবার রেওয়াজটা অবশ্য চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কি বুঝিতে হইবে যে, তাহাতেই আমরা ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীদিগের হইতে অধিকতর নৈতিক জীব হইয়া উঠিয়াছি?

১৮শ শতাব্দীর সামাজিক ব্যভিচারের জন্যই যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, আর রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন যে, সামাজিক ব্যভিচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন এমন 'সাহিত্য' ও 'সমাজের' ইতিহাস-লেখকের নিশ্চয়ই অভাব হইবে না—যাঁহারা অক্লেশে সিদ্ধান্ত করিবেন যে, বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ব্যভিচার-বৃদ্ধির একমাত্র এবং অতি গুরুতর কারণ, ১৯ বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। তর্ক সব দিকেই চলে, কিন্তু সত্যের পথ এক।

১৮শ শতাব্দীর সামাজিক ব্যভিচার ১৯ বিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কারণ, ইহা 'ব্রাহ্ম-সমাজের' ইতিহাস-লেখক বলিতে পারেন, 'রাজা রামমোহনের জীবন-চরিত'-লেখক বলিতে পারেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখক বলিতে পারেন, ইহাঁরা তবু কিছু জানেন, কিন্তু আরও অনেকে যাঁহারা অতি অল্পই জানেন, তাঁহারাও বলিতে পারেন, তথাপি আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না।

আরও অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মযুগের সমর্থনকারী ইতিহাস-লেখকগণ ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন। যাহা নিন্দার বিষয়, তাহা সব যুগেই নিন্দনীয়; জুয়াচুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া প্রভৃতি কি কেবল ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীরই ছিল? ব্রাহ্মযুগের সমর্থনকারী কোন কোন সাহিত্যিক নাকি মেকলে সাহেবকে দোষ দিতে পারেন না, সম্ভবতঃ তাঁহার বিবেকে দংশন করে, কেননা, ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র নাকি বস্তুতই—ইত্যাদি। ১৮শ শতাব্দীর বিশ্বাসঘাতকতায়, দেশদ্রোহিতায় বাঙ্গালী তাহার পরবর্ত্তী দুইটি দীর্ঘ শতাব্দীর স্বাধীনতা হারাইয়াছে। হইতে পারে, ইহা সত্য; কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর সংস্কারধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কি বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার লাঘব হইয়াছে? মুসলমান রাজাদিগের রাজসভার সংস্পর্শে আসিয়া ধনী হিন্দুগণ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের আদর্শে ক্রমে সমগ্র দেশ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল। ধরিয়া লইলাম, ইহা সত্য, আর ১৯শ কিংবা বিংশ

শতাব্দীর রাজসভার সংস্পর্শে আসিয়া ধনী হিন্দুগণ তাহাদের 'সতীত্ব' বুঝি একেবারেই অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন?

রাজ্য এবং রাজস্ব, সেই সঙ্গে একটা জাতির ভাগ্য লইয়া খেলা করিবার সুযোগ ও অধিকার ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ছিল। বাঙ্গালী, তুমি বলিতে পার, ১৮শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ভাগ্য লইয়া ভাল খেলা খেলিতে পারে নাই। তুমি বলিতে পার—বাঙ্গালী ১৮শ শতাব্দীতে পারিল না, হারিয়া গেল। সত্যই "সিংহাসন হইতে শালগ্রাম গড়াইয়া পড়িল।" কে না জানে, কে না দেখিয়াছে? কিন্তু তুমি একটা শতাব্দীকে সংস্কারের দোহাই দিয়া যে কাড়িয়া লইয়াছিলে, তুমি আজ কি করিতেছ, হে রাজসভার নিকটবর্ত্তী উত্তম পদবীপ্রাপ্ত, বিংশ শতাব্দীর ধনী বাঙ্গালী সম্প্রদায়, যাহারা রাজ-অনুগ্রহের ছায়ায় বর্দ্ধিত, যাহারা ধনী, যাহারা অবিবেকী, তাহাদের মধ্যে সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালেই, এমন কি, সর্ব্বদেশেই হইয়া আসিতেছে। কেবল ১৮শ শতাব্দীর দোষ দেও কেন? উমিচাঁদ? খুঁজিলে কি ১৯শ শতাব্দীতে মিলে না? তবে হঁ্যা—মহারাজ নন্দকুমার বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় আর সম্ভবে না--তা নন্দকুমার যতই উৎকোচ গ্রহণ করুক। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী প্রধানেরা যে অল্প পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করেন, আর অল্প পরিমাণে দেশদ্রোহিতাকার্য্য সম্পাদন করেন, তাহার কারণ,—একমাত্র কারণ, সুযোগের অভাব আর ক্ষমতার অভাব। ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ও দেশদ্রোহিতায় একটা পলাশীর যুদ্ধ বা একটা উধুয়ানালার যুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করে না সত্য, কিন্তু প্রজার অহিতকর একটা কঠোর আইন ত পাশ হয়,—সাধারণের প্রদত্ত অর্থরাশির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ত দেখা যায়! আর কত খুলিয়া বলিব? কাপড়ের কল, চিনির কল, জাতীয় ব্যাঙ্ক?—কথা না তুলাই ভাল, তুলিলেই গরল উঠিবে।

বিংশ কিংবা ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গালী প্রধানেরা কিছুতেই ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালী প্রধানদের হইতে অধিকতর নৈতিক জীব হইয়া উঠিতে পারেন নাই—১৯শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও। ইহার কারণ কি?- কারণ, ১৮শ শতাব্দীর নৈতিক দুর্গতির জন্যই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, ইহা সত্য নহে। মহারাজ নন্দকুমার যাহা পারিয়াছেন, তাহা উৎকোচগ্রহণই হউক, আর বাঙ্গালী জাতির উদ্ধারসাধনই হউক, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাহা হইতে কম পারিয়াছেন, দেওয়ান রামমোহন (তখনও রাজা উপাধি পান নাই) আবার তাহা হইতেও কম পারিয়াছেন। সুযোগ ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছে, তাহা উৎকোচগ্রহণই হউক, আর দেশোদ্ধারই হউক।

এখন বিবেচ্য, প্রিন্স দ্বারকানাথ-পুত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যুগে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে রামমোহনের ব্রহ্ম-সভা যখন প্রায় তলাইয়া যায় যায়, তাহার কিঞ্চিৎ

প্রাক্কালে ১৮৪২।৪৩ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ যখন এই ব্রহ্ম-সভাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, ১৯শ শতাব্দীর সেই মধ্যভাগে বাঙ্গলার কি সামাজিক দুর্নীতি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দূর করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ দুর্নীতিই বা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ?

রাজা রামমোহনের মত সর্ব্বগ্রাসী মনীষা দেবেন্দ্রনাথে ছিল না। যে সকল বিষয়ে, যেমন মূর্ত্তিপূজা পরিহার, তিনি রামমোহনকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সে সকল বিষয়েও রাজার উদ্দেশ্য তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। ইহা আমি অনেক স্থানে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। দেবেন্দ্রনাথের যুগে, কলিকাতায় ডিরোজীওর শিষ্যদিগের মধ্যে এবং মহাত্মা ডফ্ প্রভৃতি খৃষ্টান পাদ্রীগণের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র আন্দোলন চলিতেছিল। ডিরোজীও-শিষ্যগণ স্বাধীন চিন্তাবাদীর দল ছিলেন। তাঁহারা প্রচলিত হিন্দু আচার-নীতিকে পরিহার করাই সৎসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের বিবেক অনুযায়ী চলিবার মত দুঃসাহসিক ছিলেন। এইখানে তাঁহাদের নিন্দা ও প্রশংসা দুইয়েরই অবসর আছে। অন্যদিকে মহাত্মা ডফ্ ও তাঁহার সহযোগিগণ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করিবার জন্য সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে যুবকগণের নিকট অত্যন্ত হেয় করিয়া চিত্রিত করিতেন। সুতরাং কি ডিরোজীও-সম্প্রদায়, কি ডফ্-সম্প্রদায়, ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকের মনে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত নীচ ধারণা জন্মাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্যার রাধাকান্তের দল, ধর্ম্ম-সভা, রামমোহনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তখন অনেকটা ক্লান্ত। আর দেবেন্দ্রনাথকে স্যার রাধাকান্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে স্বীকার করিতে সম্ভবতঃ প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ ডফ্-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ, স্যার রাধাকান্তের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কাজেই নৈতিক সংস্কারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম যুগে, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত যোগ দিবার পূর্ব্বে, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগকে ডিরোজীও-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে একদিকে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে ডফ্-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতেও রক্ষা করিয়াছেন; এবং এই কার্য্যে তিনি বহু অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাহার কারণ, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এবং তাহার অবিসংবাদিত নেতা স্যার রাধাকান্ত এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কিন্তু স্যার রাধাকান্ত দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়াই যে দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যের গুরুত্ব কিছু কমিয়া যায়, তাহা নহে। রাজা রামমোহনের মত খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি দেবেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। খৃষ্টান-ধর্ম্মের নীতির প্রতি যে কারণে রামমোহন এত অধিক, হয় ত বা প্রয়োজনের অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কারণগুলি দেবেন্দ্রনাথের চক্ষে অতি অস্পষ্ট রকমেও প্রতিভাত হয় নাই, তথাপি

রামমোহন যেমন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের দার্শনিক আক্রমণ হইতে এই হিন্দুধর্ম ও ষড়্দর্শনকে রক্ষা করিয়াছিলেন, রামমোহনের স্বাজাত্যাভিমান যেমন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে দার্শনিক বাগ্বিতণ্ডায় অত্যন্ত উগ্র হইয়া দেখা দিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ রক্ষণশীল স্বভাব—তাঁহার পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাদ্রী-বিদ্বেষ, তাঁহার প্রবল আভিজাত্যবোধ ও তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা তেমনি সেকালের বাঙ্গালীর ছেলেকে ডফ্ প্রভৃতি পাদ্রীগণের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অশেষ আন্তরিকতার সহিত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম-জীবনের প্রথমে এই একটা কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ কোন গুরুগিরির অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হন নাই। বেগতিক দেখিয়া তাঁহার মুখে কোন আদেশবাদের কথা উচ্চারিত হয় নাই। রামমোহনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি তাঁহার অপেক্ষা বহু অংশে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার পথ তিনি অবলম্বন না করিয়া থাকেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিতে পারি না। দেবেন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে মহর্ষি কিংবা ঋষি পর্য্যন্ত নহেন। তিনি ধ্যানরত কিংবা গিরিগুহায় নির্জ্জন-বিলাসী সাধকও নহেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কর্ম্মী, তিনি সেবক; তিনি দ্বারে দ্বারে, এমন কি, স্যার রাধাকান্তের বাড়ীতে পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করযোড়ে সাহায্যপ্রার্থী। এ ক্ষেত্রে তাঁহার আন্তরিকতার উপর কে অবিশ্বাস করিবে? এ ক্ষেত্রে তাঁহার চেষ্টাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কে না প্রার্থনা করিবে? দেবেন্দ্রনাথ এক যুগের বাঙ্গালীর ছেলেকে ডিরোজীওর মতানুযায়ী উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন চিন্তাবাদীদের কবল হইতে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি হিন্দুধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান-ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছেন।

রাজা রামমোহনও তাঁহার কালে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ছেলেকে খৃষ্টান হইতে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। উদ্দেশ্য এক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামমোহন জ্ঞানী। তাঁহার অস্ত্র দর্শন; তাঁহার অস্ত্রযুক্তিও শাস্ত্রোদ্ধার। দেবেন্দ্রনাথ ধ্যানী। কিন্তু ইহা ত চক্ষু বুজিয়া ধ্যানের ক্ষেত্র ছিল না; ইহা ছিল প্রবল পুরুষকারের সহিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যাভিমানকে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষেত্র। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মত জ্ঞানী ছিলেন না। খৃষ্টানধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ হিসাবে রামমোহনের যে স্থান, দেবেন্দ্রনাথ তাহা দাবী করিতে পারেন না। স্বভাবতঃ দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মীও ছিলেন না; তথাপি এ ক্ষেত্রে রামমোহন হইতে ভিন্ন পথে চলিলেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টান-ধর্ম্মের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করার এক অতি গুরুতর সামাজিক প্রয়োজন, কে না স্বীকার করিবে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই

গুরুতর সামাজিক প্রয়োজনটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল —প্রথমে রাজা রামমোহনের মধ্যে, পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে। অবশ্য, এই উভয়ের রূপ এক নয়, সুরও এক নয়। খৃষ্টান-ধর্ম্মের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষার ভার যে পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে স্বীকার করিতেই হইবে, উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় একটা সামাজিক প্রয়োজন হইতে হইয়াছিল। ইহাতে ইতস্ততঃ করিবার কিছু নাই।

এখন প্রশ্ন এই, এ ক্ষেত্রে রামমোহন হইতে দেবেন্দ্রনাথের পার্থক্য কোথায়? রামমোহন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া, সকল ধর্ম্মেরই, বিশেষতঃ খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, খৃষ্টান-ধর্ম্মের একটা যথাযথ মূল্য নিরূপণ ও সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই দিক্ দিয়া রামমোহনের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্মকে একটা গ্রহণের দিক্‌ও ছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলির তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে, এমন কি, ব্যঙ্গ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই; তথাপি খৃষ্টান-ধর্ম্মের নীতিবাদকে তিনি শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন ও গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন—যদিও তাহা আমরা এখন সমালোচনার অতীত মনে করি না। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা যে জন্যই হউক, খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি তিনি বিশেষরূপ আলোচনা করেন নাই। খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি একটা বীতরাগ তাঁহার গোড়া হইতেই ছিল। হয় ত প্রিন্স দ্বারকানাথের নিকট হইতে তিনি ইহা পাইয়াছিলেন;—হয় ত তাহার আভিজাত্যবোধ এ বিষয়ে তাঁহাকে আর ধর্ম্মের ভাবে যথোচিত উদার হইতে বাধা দিয়াছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই জন্য তাঁহার মধ্যে প্রথম জীবনে একটা গ্রহণের দিক্ একেবারেই ছিল না। পরবর্ত্তী জীবনের খৃষ্ট-বিভীষিকা ও ১৮৬৬ খৃঃ কেশব-বিচ্ছেদের ইহাও একটা গুরুতর কারণ। রাজা রামমোহন যেমন খৃষ্টান-ধর্ম্মকে তত্ত্বের দিক্ হইতে নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—অর্থাৎ ধর্ম্ম হিসাবেও ইহার ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া ইহার আশু সংস্কারের জন্য পাদ্রীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্ব ও দর্শন জানা না থাকায়, তত্ত্বের দিক্ দিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবার কোনই সুবিধা পান নাই। প্রবল, দুর্দ্ধর্ষ স্বাজাত্যাভিমানের দিক্ দিয়া স্বভাবতঃ ধ্যানী হইয়াও ঘাতসংঘাতসঙ্কুল কর্ম্মের পথে তিনি খৃষ্টান-ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ রামমোহনের পরে যেমন একদিকে তাঁহার হৃদয়ের প্রসারতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়, আবার অন্যদিকে তেমনি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির গভীরতারও পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, কেহ যেন মনে না করেন যে, খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষই স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন।

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি সে বহিষ্কার-নীতি

অবলম্বিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে কেশবচন্দ্রের যুগে যদিও তাহা রক্ষিত হয় নাই এবং তাহা যে কেশবচন্দ্রের পক্ষে সর্ব্বাংশেই নিন্দার বিষয়, তাহা নহে; তথাপি দেবেন্দ্রনাথের খৃষ্টান বহিষ্কার-নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসের একটি অধ্যায়। গুরুত্ব হিসাবে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কার্য্য হিসাবে কে বলিবে, তাঁহার জীবনচরিতের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অধ্যায় কি না?

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

সমালোচনা

ব্রাহ্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব—বিগত ৭ই মাঘ সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম-মিশিনরী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল উল্লিখিত বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (৪৩ভাগ, ২৪শ সংখ্যা, ১৬ই চৈত্র ১৩২৫)।

ঘোষাল মহাশয় প্রথমেই বঙ্গ-সাহিত্যের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার গভীর গবেষণালব্ধ কয়েকটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন; প্রলাপোক্তি হইলেও সাধারণে জানিয়া রাখুন—

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। কারণ, তিনি বোধোদয়ে লিখিয়াছেন—"ঈশ্বর নিরাকার- চৈতন্যস্বরূপ।" যাহা পাঠ করিয়া শত শত পৌত্তলিক বালকের চিত্ত সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

(২) "বাংলা সঙ্গীতে স্বরবিচিত্রতা আদপেই ছিল না।" যেহেতু, রামপ্রসাদ, দাশরথি রায়, নিধুবাবুর সঙ্গীতগুলির সুর একঘেয়ে (অবশ্য অশ্লীল বৈষ্ণব-পদাবলী ও কীর্ত্তনের কথা উল্লেখের যোগ্য নহে)। "ব্রাহ্ম-সমাজ বাংলা গানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।" ইহার প্রমাণ "জগতের সাহিত্যিকগণ ব্রহ্ম-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন।" এবং "শ্রেষ্ঠ বাংলা গান বলিতে ব্রহ্মসঙ্গীতই বুঝায়।"

(৩) "বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলে এক বস্তু।"

(৪) "কবি রজনীকান্ত সেনের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে।"—ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকে প্রভাবের কি মহিমা!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঘোষাল মহাশয় ভারতীয় ধর্ম্মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দেখিলেন, মুসলমানগণের ভারতাগমনের ফলে দুইটি উদার ধর্ম্ম "হিন্দু জাতি-ভেদের নিগড় ভাঙ্গিয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছিল। একটি নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম, আর একটি চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম।" এই দুইটি ধর্ম্ম বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা ঘোষাল মহাশয় আলোচনা করেন নাই; খুব সম্ভব অকৃতকার্য্য হইয়াছিল বলিয়াই "ইংরাজ আগমনের পর ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ অভ্যুদিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মে এব্রাহিম ধারা এবং ঋষিধারা গঙ্গা-যমুনার ন্যায় সম্মিলিত হইয়াছে—পূর্ব্বপশ্চিমে একীকরণ হইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম একদিকে যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, তেমনি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মও বটে।" কিন্তু এ হেন যুগধর্ম্মের

পরেও অন্যায়রূপে ভ্রমাত্মক 'তিনটি ধর্ম্মমণ্ডলী ভারতক্ষেত্রে নূতন অভ্যুদিত হইয়াছে;—আর্য্যসমাজ, থিয়সোফিক্যাল সোসাইটী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মণ্ডলী।" কিন্তু এই সম্প্রদায় তিনটির উপর ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব যে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান, ইহা বোধ হয়, যাঁহারা তলাইয়া দেখিবার অবসর পান নাই, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মিশিনরী মহাশয় বলিয়াছেন:—

(১) আর্য্যসমাজ;—আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসিয়া "কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আনন্দলাভ করেন এবং কেশবচন্দ্রের পরামর্শে তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। জাতিভেদ-পীড়িত, মূর্ত্তিপূজায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম্ম—একেশ্বরবাদ জাগাইবার চেষ্টা করেন।"—অতএব "হিন্দুসমাজের সংস্কারকদল"টির উপর ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল।

(২) থিয়সোফিক্যাল সোসাইটী;—"ইহার থিওলজিও নাই, সাধনাও নাই। সমবেতভাবে গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং আলোচনাতেই যেন এ ধর্ম্ম পর্য্যবসিত। অতএব এ কথা অতি সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে কি ভারতবর্ষে, কি জগতের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মের যে অভিব্যক্তি হইতেছে, মতে ও সাধনায় যে সকল ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবই দৃষ্ট হয়।" কি চমৎকার যুক্তিচাতুরী। সমগ্র জগতের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের অদ্ভুত প্রভাবের কথা শুনিয়া একটি গল্প মনে পড়িল। এক বাবু বাজারে আম কিনিতে গিয়াছেন। আম্র-বিক্রেতা বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় আম্রগুলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিল। বাবুটি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমগুলি যে বড় ছোট দেখ্‌ছি হে।" প্রত্যুৎপন্নমতি আম্র-বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—"আজ্ঞে হাঁ, আম ছোট বটে, কিন্তু আঁঠি বেশ বড় আছে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ আমটি ছোট হইলেও তাহার প্রভাবরূপ যে আঁঠি, তাহা খুব বড়। ঘোষাল মহাশয় যখন এইরূপ যুক্তিসমূহ দ্বারা "আধ্যাত্মিক প্রভাবের" ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃগণের হৃদয় এই বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের প্রতি করুণাবিমিশ্র সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল কি না, এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন?

(৩) রামকৃষ্ণ পরমহংসের মণ্ডলী;—রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর কেশবের প্রভাব বা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া ইনি রামকৃষ্ণ-জীবনীর এক অপূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশ সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। উহা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। "ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয় রামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দের সহিত সম্বন্ধ নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।"—"প্রতি পূর্ণিমাতে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট যাইতাম, তাঁহার সহিত অনেক কথা হইত; কিন্তু যতবার তাঁহার নিকট যাইতাম, তিনি একটি কথা প্রত্যেকবারই বলিতেন—'দেখ, তোমাদের ভিতর কেশব একটা লোক।' বার বার এ কথা তিনি বলিতেন বটে, কিন্তু

প্রথমতঃ তাহার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; কারণ, পরমহংস মহাশয় সে বিষয়ে আর কিছু বলিতেন না। একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 'এত দিন আপনার নিকট আমি আসিতেছি, কৈ, আমাকে একদিনও তো কালীর কাছে লইয়া গেলেন না? চলুন, আজ আপনার সহিত দেখিয়া আসি।' তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'যাও না, গিয়ে দেখে এসো না। আমি ও শালীর কাছে যাই না, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি গিয়ে দেখে এসো।' আমি বলিলাম, 'আমি ব্রাহ্ম, আমাকে উহারা মন্দিরের ভিতর যাইতে দিবে না। আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।' তিনি বলিলেন, 'আমি ও শালীর কাছে যাইব না। ও শালী আমাকে এতদিন ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, আমাকে সত্যপথে যাইতে দেয় নাই। আমি আর উহার কাছে যাইব না। তুমি যাও, দেখিয়া এসো, কেহ যাইতে বারণ করিবে না, তবে পায়ের জুতা খুলিয়া ভিতরে যাইতে হয়, এই নিয়ম।' পরে একদিবস যখন আমি তাঁহার নিকট যাই, তখন নানাকথার পর আমাকে আবার বলিলেন, 'দেখ, তোমাদের ভিতর কেশব একটা লোক।' তাহার পরদিবস প্রাতে যখন তিনি একটা গাড়ু হস্তে লইয়া নিত্যক্রিয়ায় যাইতেছিলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এস।' আমি বলিলাম, 'আপনি গাড়ু-হস্তে নিত্যক্রিয়ায় যাইতেছেন, আপনার সঙ্গে আমি কোথায় যাইব?" তাহাতে তিনি বলিলেন, 'এস না, তোমার সহিত কথা আছে।' কিয়দ্দূর গিয়া পুনরায় বলিলেন, –'তোমাদের কেশব একটা লোক। ঐ আমাকে ব্রহ্মকে দেখাইয়াছে। ঐ শালী (কালীমূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া) আমাকে এতদিন ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, সত্যপথ দেখিতে দেয় নাই। একদিন সন্ধ্যার সময় যখন আমি সাধনস্থলে বসিতে যাইতেছিলাম, তখন কে যেন আসিয়া আমাকে বলিলেন, -এস, আমার সঙ্গে এস। আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। তিনি আমাকে গঙ্গার তীরে লইয়া ঘাটের এক নিম্নতম ধাপে বসিতে বলিলেন। আমি সেখানে যেই সাধনার্থ বসিলাম, তখন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই দর্শন আমার একমাত্র কেশব-সহবাসের ফল, আর কিছুই নয়! তাই বলি, তোমাদের ভিতর কেশব একটা লোক!' আমি রামকৃষ্ণের শিষ্যদের লিখিত তাঁহার জীবনচরিত -'কথামৃত' ও অন্যান্য জীবনী পড়িয়া দেখিয়াছি; কিন্তু আমার উক্ত বিবরণটি কোথাও দেখিতে পাই নাই। এ কথা লিখিলে তাঁহার শিষ্যদের আঁতে ঘা পড়িবে বলিয়া তাঁহারা যে এ কথা চাপিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

নববিধান সমাজের ভ্রাতা ত্রৈলোক্য বাবু গঞ্জিকা সেবন করেন, এ অপবাদ তাঁহার অতি বড় শত্রুও দিতে পারিবেন না, যেহেতু, তিনি ব্রাহ্ম—আদর্শ-নীতিবাদী। চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করিয়া বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অহিফেনসেবন করেন কি না, তাহাও আমি অবগত নহি। ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিসভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনের চিহ্নস্বরূপ "স্বাস্থ্যপান"

চলিয়াছিল কি না, তাহাও বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অপরের পক্ষে বলা দুষ্কর। না হয়, তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম, উক্ত দিবস তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইবার কোন বিশেষ কারণ ঘটে নাই। রামকৃষ্ণের জীবনী ও কথামৃত-লেখক তাঁহার বিবরণটি চাপিয়া রাখিয়াছেন, নিঃসন্দেহে তিনি এ মত ব্যক্ত করিলেন কিরূপে, তাহা সাধারণে জানিতে পারে কি? আমার মনে হয়, উক্ত জীবনীলেখকগণ অন্তর্যামী নহেন; অতএব যে কথা আজ চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ব্রাহ্মভ্রাতার অন্ধকারময় গোপন হৃদয়-গুহায় নিহিত ছিল, তাহা তাঁহারা জানিবেন কি করিয়া? রামকৃষ্ণ-জীবনীলেখক এত কষ্ট করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই পণ্ডশ্রম—কারণ, সত্যবাদী ব্রাহ্মভ্রাতা বলিতেছেন—

(১) কেশব রামকৃষ্ণকে ব্রহ্মদর্শন করাইয়াছেন।

(২) সত্যপথে যাইতে দেয় নাই, এবং এতদিন ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া তিনি কালীকে শালী বলিয়া আর উঁহার নিকট যান নাই।

(৩) সার কথা—কেশব-সহবাসের ফলে তিনি পৌত্তলিকতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।

অতএব পরবর্ত্তী সংস্করণে রামকৃষ্ণ-জীবনীগুলি নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। তোতাপুরীর নিকট বেদান্ত দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট সাধন-সহায়ে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছিলেন—এ সব আজগুবী গল্প আর বাজারে বিকাইবে না! নববিধানী ভ্রাতাকে আমার বিনীত অনুরোধ, কোন্ সালের কোন্ তারিখ হইতে রামকৃষ্ণ কালীকে শালী বলিয়া উঁহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সত্বর প্রকাশ করিবেন; নতুবা রামকৃষ্ণ-জীবনীতে অনিবার্য্যরূপে অনেক মারাত্মক ভ্রম থাকিয়া যাইবে।

ত্রৈলোক্য বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, বহুদিন পূর্ব্বে যখন কেশব ও রামকৃষ্ণের কথা লইয়া রেভাঃ প্রতাপ বাবু ম্যাক্সমুলরের দরবারে হাজীর হইয়াছিলেন, সত্য-মিথ্যায় জড়িত করিয়া নানাবিধ বিবরণে অধ্যাপকের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আপনি এ কথা প্রকাশ করেন নাই কেন? তখন কি আপনি "ব্রহ্মানন্দাশ্রমে" মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিলেন? কি অটুট সংযম! ভ্রাতাকে বিপন্ন দেখিয়াও আপনার ব্রহ্মানন্দে ভরপুর চিত্ত বিচলিত হইয়া এ অপূর্ব্ব রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রকাশ করিল না! আপনিই ধন্য! নববিধান সমাজের মধ্যে একটা লোক! রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় সাধু-সহবাসে আপনিই যথার্থ উপকৃত হইয়াছেন, আর সকলে কেবল অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধকারেই হাতড়াইয়া মরিয়াছে—এ কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের আঁতে ঘা পড়ে, পড়ুক,—ইহা হাঁকিয়া-ডাকিয়া দশজনকে শুনাইবার মত কথা। কিন্তু ঐ ত্রৈলোক্য বাবু, ভক্তচূড়ামণি কেশবের সহিত পরমহংসের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে,